বয়সঃ ৮-৯

শিশু মনে দ্বীনের আলো ২

মুহাম্মদ আতিকুর রহমান তারেক

- আকাইদ ও আখলাক
- ফিকহ ও আহকাম
- আদ'ইয়্যাত ও আদাব
- কাসাসুল আম্বিয়া
- সিরাতুন নবী সা.
- হিকায়াতুস সাহাবা

শিশু, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলের প্রিয় যোগোপযোগী একটি উন্নত ইসলাম শিক্ষা সিলেবাস ও পাঠ্য বই

ভূমিকা

শিশুদের যেভাবে গড়ে তুলবেন, তারা সেভাবেই বেড়ে উঠবে। আজকের অবোধ শিশুটিই উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে আগামী দিনের আলোর দিশারী হবে। শিশুর কচি মনে সত্য ও সুন্দর গেঁথে দিতে পারলে তা ফুলে ফলে সুশোভিত হবেই একদিন। দ্বীনের মৌলিক শিক্ষাগুলো এক একটি উজ্জ্বল বাতি, যা শিশু মনে আলো ছড়িয়ে তাদের ভবিষ্যৎ কে করবে আলোকিত। উপযুক্ত পরিবেশ ও সুশিক্ষা পাওয়া প্রতিটি শিশুর জন্মগত অধিকার।

শিশুদের এ অধিকার যেমন তাদের পিতা- মাতার উপর, তেমনি তাদের শিক্ষক ও সমাজের কর্তাব্যক্তিদের উপর। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেমন সুশিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশের অভাব, তেমন রয়েছে উন্নত শিক্ষা উপকরণের অপ্রতুলতা। সুশিক্ষা নিশ্চিত করতে সুন্দর পরিবেশের পাশাপাশি প্রয়োজন উন্নত মানের শিক্ষা উপকরণ। '**শিশু মনে দ্বীনের আলো**' বইটি সে প্রয়োজন পূরণে সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সহজ করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি বইটিতে। শিশুদের গড়ে তুলতে পারবারিক পরিবেশে কিম্বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমানভাবেই বইটি ব্যবহার করা যেতে পারে। বইয়ের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিশুদের উপযোগী করে তৈরী করা হয়েছে প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য এক একটি "**এনিমেশন ভিডিও**"।

বইয়ের সাথে ভিডিওগুলো মিলিয়ে শিশুদের তারবিয়াত দিলে আশা করি সত্যিই তারা ভালো ঈমানদার হিসাবে গড়ে উঠবে। পূরণ হবে পিতা-মাতা, শিক্ষক ও সমাজের আশা। প্রাথমিক স্তরের **ইসলাম শিক্ষা** বিষয়ের এটি দ্বিতীয় বই। প্রথম বইটি ইতিপূর্বে শিক্ষক, অবিভাবক ও সুধী মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। পরবর্তী বই গুলো শীঘ্রই আসছে, ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মদ আতিকুর রহমান তারেক

ডিরেক্টর, বালাগ ইনস্টিটিউট

নিউক্যাসল, ইউ কে, নভেম্বর ২০২৩

সূচিপত্র

আকাইদ (ঈমান ও বিশ্বাস) ---------- ১

পাঠ ১: আল্লাহ এক ---------- ৩

পাঠ ২: আমাদের সৃষ্টিকর্তা ---------- ১০

পাঠ ৩: ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি ---------- ১৯

আখলাক (নৈতিক চরিত্র) ---------- ৩১

পাঠ ১: আল্লাহর প্রতি সম্মান ---------- ৩৩

পাঠ ২: মানবজাতির প্রতি সম্মান ---------- ৪২

পাঠ ৩: সৃষ্টি জীবের প্রতি সম্মান ---------- ৫০

ফিকহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র) ---------- ৫৮

পাঠ ১: তাহারাত ---------- ৬০

পাঠ ২: ইস্তিঞ্জা ---------- ৬৭

পাঠ ৩: অজু ---------- ৭৮

পাঠ ৪: সালাত ---------- ৮৮

আদ'ইয়্যাত ও আদাব (দুয়া দুরুদ ও শিষ্টাচার) ---------- ৯৯

পাঠ ১: কালিমা তাইয়্যিবা ও শাহাদাহ ---------- ১০৩

পাঠ ২: ঈমান মুজমাল ও মুফাস্‌সাল ---------- ১০৭

পাঠ ৩: খাওয়ার দুয়া ও আদাব ---------- ১১১

পাঠ ৪: ঘুমের দুয়া ও আদাব ---------- ১১৪

পাঠ ৫: সালাম ও কুশল বিনিময় ---------- ১১৭

পাঠ ৬: হাঁচির দুয়া ও আদাব ---------- ১২০

পাঠ ৭: উপহার ও ধন্যবাদ জানানো ---------- ১২৩

পাঠ ৮: গুরুত্বপূর্ণ ইসলামিক অভিব্যক্তি ---------- ১২৬

কাসাসুল আম্বিয়া (নবীদের জীবনী) ---------- ১২৯

পাঠ ১ : দুনিয়ার সূচনা ---------- ১৩১

পাঠ ২ : আদম আ.। ও হাওয়া আ. ---------- ১৪০

সিরাতুন নবী (মুহাম্মদ সা. এর জীবন চরিত) ---------- ১৫৪

পাঠ ১ : নবী মুহাম্মদ সা. ও তাঁর জন্ম ---------- ১৫৬

পাঠ ২ : নবী মুহাম্মদ সা. এর যৌবনকাল ---------- ১৬৫

পাঠ ৩ : নবী হলেন যখন ---------- ১৭৫

হিকায়াতুস সাহাবা (সাহাবীদের জীবনী) ---------- ১৮৫

পাঠ ১ : সায়্যেদুনা আবু বকর রা. ---------- ১৮৮

পাঠ ২ : সায়্যেদাতুনা আয়েশা রা. ---------- ১৯৮

আকাইদ
(ঈমান ও বিশ্বাস)

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস

বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালনকারী এবং প্রকৃতির নিয়ন্ত্রক ও পরিবর্তনকারী মূলত এক ও অভিন্ন সত্তা, যাকে আমরা আল্লাহ বলে ডাকি। আল্লাহ হচ্ছেন সবকিছুর একমাত্র স্রষ্টা এবং সকল সৃষ্টির ওপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যখন বিশ্ব জগতে কিছুই ছিল না, তখন তিনি ছিলেন, আবার সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেলেও তিনি সর্বদা থাকবেন। তার অস্তিত্ব, ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণশক্তির সাথে অন্য কোনো সৃষ্টির তুলনা হয় না।

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এমন একটি শক্তি যা নির্দেশনা দেয় সঠিক জ্ঞান অর্জন, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা লাভ, উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠন, দুনিয়ার সুখ-শান্তি এবং উন্নতি লাভের। যে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাকে অবশ্যই আল্লাহর নাম এবং গুণাবলি সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাকে জানতে হবে, আল্লাহ নির্ভুল এবং তিনি সকল প্রকার দুর্বলতা ও ত্রুটি থেকে মুক্ত। তাকে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ এক, তার সাথে কোন শরীক নেই, তাকে কেউ জন্ম দেয়নি এবং তিনিও কাউকে জন্মদান করেননি। তাকে বুঝতে হবে, আল্লাহ তার সৃষ্টিকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতি করুণাময়। তিনি তার অপরিসীম দয়া ও করুণার কারণেই সৃষ্টিকে সঠিক পথ নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

আল্লাহ অত্যন্ত সুউচ্চ ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু একই সাথে তিনি পুণ্যবান লোকদের খুবই নিকটবর্তী ও তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন। যে তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। যে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তিনি তাকে সাহায্য করেন। যে তার কাছে পথ নির্দেশনা চায় তিনি তাকে পথপ্রদর্শন করেন। যে তার কাছে সুখ শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে তিনি তাকে তার সবকিছু দান করেন। তিনি এতই করুণাময় যে তার কাছে প্রার্থনা করে কেউ কখনো বিফল হয়না। আল্লাহ তার সৃষ্টিকে কতটুকু ভালবাসেন তা আমরা কল্পনাও করতে পারবো না। তার দয়া এবং অনুগ্রহ ব্যতীত একটি মুহূর্ত আমরা বেঁচে থাকতে পারবো না। আর মৃত্যু পরবর্তী জীবনে আমরা তার দয়া লাভ করব যদি আমরা তার প্রতি বিশ্বাসী হই এবং তার নির্দেশনা মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালনা করে থাকি। তিনি মানুষকে দিয়েছেন একটি বুদ্ধিমত্তা যা দ্বারা তারা ভালো মন্দ বুঝতে পারে, দিয়েছেন একটি আত্মা যার মাধ্যমে তারা সত্য ও সুন্দরকে কে উপলব্ধি করতে পারে এবং সৃষ্টির কল্যাণে কাজ করতে সক্ষম হয়।

আল্লাহর দয়া ও তার ইবাদত

আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা আমাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে এবং শান্তি যোগায়। আল্লাহর দয়ার প্রতি আস্থা আমাদের দুঃখ-বেদনা দূরীকরণে সহায়তা করে, আমাদের জীবনের কঠিন মুহূর্ত গুলো অতিক্রম করতে সাহস যোগায় এবং সাফল্যের মঞ্জিলে পৌঁছাতে যোগায় অনুপ্রেরণা। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল মুহূর্তে দৃশ্যমান এবং সৃষ্টি জগতের সর্বত্র বিরাজমান।

আল্লাহ স্বয়ং সম্পূর্ণ। তাই এত দয়া ও অনুগ্রহের পরও আল্লাহ তার সৃষ্টির কাছ থেকে কিছুই চান না। আমাদের কল্যাণের জন্যই তিনি আমাদেরকে তার ইবাদত করতে বলেছেন, তার প্রয়োজনে নয়। আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য আমাদের জীবনে প্রশান্তি আনে। আর বিনিময়ে আল্লাহ আমাদের করেন দুনিয়া আখেরাতে পুরস্কৃত।

আল্লাহকে জানার উপায়

আল্লাহকে জানার এবং চেনার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। আল্লাহকে চেনার সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে এই বিশ্ব জাহান যাকে একটি বিশাল খোলা বইও বলা যেতে পারে। যার প্রতিটি পরতে পরতে আল্লাহর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে পথ দেখাতে যুগে যুগে পাঠিয়েছেন অনেক নবী এবং রাসূল। তারা মানুষকে আল্লাহর ও তার গুণাবলি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে দিক-নির্দেশনা (ওহী) লাভ করেছেন। সেই দিকনির্দেশনার আলোকেই তারা আল্লাহর ব্যাপারে মানুষের করণীয় কি তা সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে গিয়েছেন। আল্লাহর নাজিলকৃত কিতাবগুলো পড়ে আমরা তার সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারি এবং আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য বুঝে নিতে পারি।

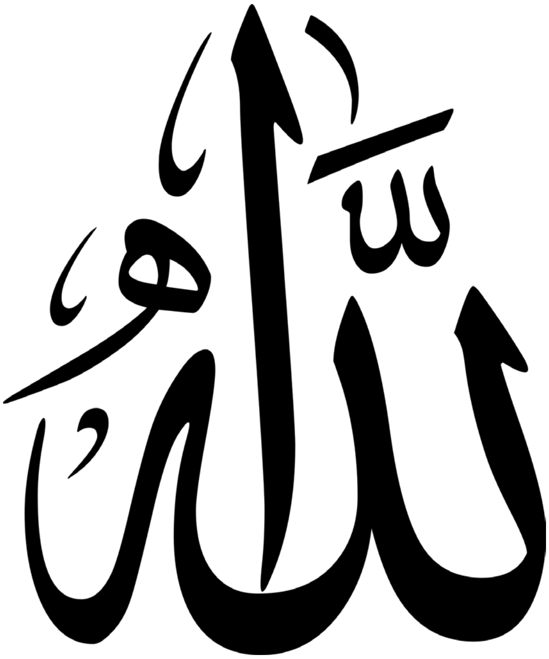

পাঠ ১

আল্লাহ এক

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও বুঝতে সক্ষম হবে,

- *আল্লাহ এক ও তার কোন শরীক নেই। তিনি চিরন্তন ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকার*
- *যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ থাকতো তবে সৃষ্টি জগতে বিশৃঙ্খলা দেখা যেত*
- *আল্লাহকে স্মরণ করার সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো তার একত্ববাদের ঘোষণা দেয়া*
- *“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ ব্যতিত আর কোনো ইলাহ নেই) হচ্ছে সর্বোত্তম জিকির*
- *আল্লাহ যেমন মহান, তেমনি তার পবিত্র নাম এবং বাণীও সবকিছুর চেয়ে মহান ও সম্মানিত*

আল্লাহ এক

আল্লাহ এক। আল্লাহর কোন শরীক নেই। আল্লাহর নেই কোন স্ত্রী ও সন্তান। কেউ তাকে জন্ম দেয়নি ও সৃষ্টিও করেনি। কারণ, তিনি স্রষ্টা। কোন কিছুই তার মতো মত নয়। আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি সর্বদা ছিলেন এবং সর্বদা থাকবেন। তিনি কখনো ধ্বংস হবেন না। তার কোন মৃত্যু নেই।

আল্লাহ পরিপূর্ণ স্বাধীন। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। তার কাজে তাকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। সকল সৃষ্টি তার মুখাপেক্ষী। সকল সৃষ্টি তার সাহায্য প্রার্থী। কারো নিকট থেকে তার সাহায্য নিতে হয় না। তিনি হও বললেই হয়ে যায়। সকল সৃষ্টি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তার নির্দেশনা মেনে চলছে।

তার ইচ্ছা ব্যতীত আমরা আমাদের কোন প্রয়োজন পূরণ করতে পারিনা। আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা ও একমাত্র উপাস্য। আমাদের উচিত, সকল কাজে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া ও তার ইবাদত করা।

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

আর জেনে রাখো, আল্লাহ ব্যতিত কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই।

সূরা মুহাম্মদ : ১৯

শিক্ষক ও অভিবাকদের জন্য

(ছাত্র /ছাত্রীদের কাছে সহজ করে ব্যাখ্যা করবেন)

আল্লাহ যে এক, তার প্রমাণ কি?

- আল্লাহ মানুষের জন্য তার কিতাব নাযিল করেছেন। এসব কিতাবে তিনি বলে দিয়েছেন, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই।
- দুনিয়াতে অসংখ্য নবী এবং রাসূল আগমন করেছেন। তারা ছিলেন সত্যবাদী। তারা সকলেই বলেছেন আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।
- আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশক্তিমান। তিনি হও বললেই হয়ে যায়। কোন কাজে তাকে কারো কাছ থেকে সাহায্য নিতে হয় না। তাই তার কোন শরীক বা অংশীদার প্রয়োজন পড়ে না। অংশীদার কেবল তারই প্রয়োজন যে দুর্বল।
- আল্লাহর সৃষ্টি অত্যন্ত নিখুঁত। এ সৃষ্টিতে আমরা সর্বদা শৃঙ্খলা ও শান্তি দেখতে পাই। যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ থাকতো, তবে সৃষ্টিতে আমরা সর্বদা বিশৃঙ্খলা দেখতে পেতাম।
- একটি ক্লাসে যেমন একজন শিক্ষক থাকেন, একটি গাড়িতে যেমন একজন ড্রাইভার থাকে, একটি প্লেন যেমন একজন পাইলট নিয়ন্ত্রণ করে এবং একটি দেশের যেমন একজন রাষ্ট্রপ্রধান থাকে, তেমনি এ মহাবিশ্বের স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রক একজনই। আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহ।
- যেহেতু এই মহাবিশ্বে আমরা কখনো কোন বিশৃঙ্খলা দেখতে পাচ্ছি না। অতএব এ সুশৃংখল পৃথিবী প্রমাণ করে, এর স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রক একজনই।
- আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, যদি আকাশে ও পৃথিবীতে এক আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ হতো তাহলে (পৃথিবী ও আকাশ) উভয়ের ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যেতো। সূরা আল আম্বিয়া: ২২

অনুশীলনী ১

ক. নিচের ঘরে রক্ষিত শব্দ সমূহ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ইলাহ	মুখাপেক্ষী	সাহায্য	সর্বদা	শরীক	ইচ্ছা	নির্দেশনা	প্রয়োজন	উপাস্য

- আল্লাহর কোন ---------- নেই।
- আল্লাহ ছাড়া আর কোন ------------- নেই।
- আল্লাহ সর্বদা ছিলেন এবং ------------ থাকবেন।
- আল্লাহ পরিপূর্ণ স্বাধীন, তিনি যা ---------- তাই করেন।
- সকল সৃষ্টি তার ---------------, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।
- সকল সৃষ্টি তার --------- প্রার্থী, কারো নিকট থেকে তার সাহায্য নিতে হয় না।
- সকল সৃষ্টি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তার ---------- মেনে চলছে।
- তার ইচ্ছা ব্যতীত আমরা আমাদের কোন ----------- পূরণ করতে পারিনা।
- আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা ও একমাত্র --------।

খ. আল্লাহর গুণাবলির উপযোগী শব্দ সমূহ কে বৃত্ত দ্বারা আবৃত কর।

এক	সর্বদা থাকবেন	সাহায্যপ্রার্থী	স্ত্রী আছে
পরিপূর্ণ স্বাধীন	অক্ষম	মুখাপেক্ষী	শরিক নেই
একমাত্র উপাস্য	আমাদের মত	সন্তান আছে	পিত-মাতা নেই
	মৃত্যু আছে	প্রয়োজন নেই	

গ. রং কর।

اللّٰهُ أَحَدٌ

আল্লাহ এক

হাদিসের গল্প

নবী মুসা আ. ও আল্লাহর জিকর

একদা নবী মূসা আ. আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা দিয়ে আপনাকে ডাকতে পারি ও আপনার জিকির করতে পারি।

আল্লাহ তখন নবী মূসা আ. কে বললেন, সব চেয়ে উত্তম জিকির হলো "*লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ*" (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)।

নবী মুসা আ. বললেন, হে আমার রব! এ জিকির তো সকল সৃষ্টি করে। আল্লাহ বললেন, তুমি পড়ো "*লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ*" (ছাড়া কোন ইলাহ নেই)।

মুসা আ. তাতেও তৃপ্ত হতে পারলেন না। তিনি বললেন, হে আমার রব ! আমি এমন একটা জিকির চাচ্ছি যা কেবল আমিই করবো, যা ইতোপূর্বে অন্য কোন সৃষ্টি করে নাই।

আল্লাহ তার উত্তরে বললেন, হে মুসা ! যদি সাত আকাশ ও সাত পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছু এক পাল্লায় রাখা হয় এবং অন্য পাল্লায় রাখা হয় "*লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ*" তাহলে "*লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ*"র পাল্লাই ভারী হবে।[১]

১. *নাসায়ী, ইবনে হাব্বান ও আল হাকিম আবু সাঈদ আল খুদরী রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাব্বান এটাকে সহীহ গণ্য করেছেন)*

অনুশীলনী ২

১। নিচের আরবি কালিমাটি রং কর এবং নির্দেশিত স্থানে তার অর্থ লিখ।

لا إله إلا الله

অর্থ লিখ:

الخَالِقُ

পাঠ ২

আমাদের সৃষ্টিকর্তা

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে পারবে,

- *আল্লাহ হলেন এ মহা বিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও বিকাশ দানকারী*
- *আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্বে এনেছেন তার ক্ষমতা ও নির্ভুলতা প্রমাণ করতে*
- *আল্লাহ সৃষ্টির মাধ্যমে তার গুণাবলি ও মহানত্বের প্রকাশ করেছেন*
- *সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আমরা আল্লাহর গুণাবলি উপলব্ধি করতে পারি*
- *আল্লাহর অস্তিত্ব না থাকলে কোন সৃষ্টি অস্তিত্বে আসতে পারতো না*
- *সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর অস্তিত্ব ও তার অসাধারণ গুণাবলির প্রমাণ পেশ করছে*

আমাদের সৃষ্টিকর্তা

একটি সুন্দর গাড়ি দেখলে মনে হয়, কে তা বানিয়েছে ? আর মোবাইল ফোন হাতে নিলে প্রশ্ন জাগে কে তার আবিষ্কারক? অনুরূপ প্রত্যেকটি বস্তু তার নির্মাতার কথা মনে করিয়ে দেয়।

আর আমরা যখন আমাদের চারদিকে অসংখ্য সৃষ্টি দেখতে পাই, তখন মনে প্রশ্ন জাগে কে তা সৃষ্টি করেছেন। কে বানিয়েছেন এই আসমান, এই যমীন, এই সাগর ও পাহাড়? এগুলো তো এমনি এমনি সৃষ্টি হয়নি। কোন এক মহা কারিগর তা সৃষ্টি করেছেন। হ্যাঁ, যে মহান স্রষ্টা এ পৃথিবী ও তার মধ্যস্থিত সব কিছু সৃজন করেছেন তিনি হলেন আল্লাহ।

আল্লাহ এ মহাবিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন ফেরেশতা এবং না দেখা অনেক জগৎ। তিনি সৃষ্টি করেছেন চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহ নক্ষত্র। আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন নদ-নদী, সাগর ও পাহাড়-পর্বত। তিনি সৃষ্টি করেছেন গাছপালা, তরুলতা, পশুপাখি ও কীট-পতঙ্গ।

আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাকে, আমাকে ও আমাদের পিতা মাতাকে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সমস্ত মানবকুল। আল্লাহ হচ্ছেন মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা।

এ মহা বিশ্বের সৃষ্টি আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ করে। সৃষ্টি জগতের নিপুণ কারুকার্য আল্লাহর অপার গুণাবলি ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের জানান দেয়। আল্লাহর অন্যতম নাম হলো আল খালিক। খালিক মানে সৃষ্টিকর্তা।

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل

আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক

সূরা যুমার:৬২

অনুশীলনী ৩

ক. সত্য-মিথ্যা নির্ণয় কর। সঠিক ঘরে ঠিক (✓) চিহ্ন দাও।

<u>সত্য</u> <u>মিথ্যা</u>

☐ ☐ একটি সুন্দর গাড়ি দেখলে মনে পরে তার একজন প্রস্তুত-কারক আছে।

☐ ☐ এ মহা বিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, তিনি হলেন আল্লাহ।

☐ ☐ ফেরেশতাগণ না দেখা অনেক জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

☐ ☐ চন্দ্র-সূর্য, নদ-নদী ও পাহাড় আপনা আপনি সৃষ্টি হয়েছে।

☐ ☐ মানুষকে কেউ সৃষ্টি করেননি, তারা বানরের বংশধর।বিশাল এ সৃষ্টি জগৎ আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়।

☐ ☐ আল্লাহর গুনবাচক নাম ‘আল খালিক’ অর্থ হল ‘পালনকর্তা’।

খ. নিচের আরবি শব্দটি রং কর অতঃপর তার অর্থ লিখ।

الخَالِقُ

অর্থ লিখ: --

গ. নিচের শব্দগুলো শব্দ ধাঁধা হতে খোঁজ বের করো ও বৃত্ত দ্বারা চিহ্নিত করো।

সৃষ্টিকর্তা	ফেরেশতা	মহাবিশ্ব	গুণাবলি	অস্তিত্ব	আবিষ্কারক	তরুলতা

ম	আ	বি	অ	স্তি	আ	ম	ত	তা	ক
হা	ম	লী	রু	ত	লী	ক	ত	রু	ফে
বি	লী	র্তা	ফে	ত	রু	ল	তা	ফে	আ
শ্ব	ক	সৃ	ষ্টি	র	ফে	তা	ম	ম	বি
ল	আ	ষ্টি	ল	গু	ল	রে	ফে	হা	ষ্কা
তা	ক	ক	ম	ণা	আ	ত	শ	বি	র
আ	বি	র্তা	তা	ব	ল	লী	ল	তা	ক
অ	স্তি	ত্ব	হা	লী	ক	হা	রু	ফে	তা

ঘ. উপরের পাঠে উল্লেখ নেই আল্লাহর এমন পাঁচটি সৃষ্টির নাম লিখ।

____________________ ____________________

____________________ ____________________

____

শিক্ষক ও অভিবাকদের জন্য

(ছাত্র /ছাত্রীদের কাছে সহজ করে ব্যাখ্যা করবেন)

কেন আল্লাহ এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন ?

- আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, সৃষ্টিকে তাঁর অস্তিত্বের নিদর্শন স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন।
- সৃষ্টি কর্মের মাধ্যমে তিনি তার নিঁপুণতা, পরিপূর্ণতা এবং অপরিসীম ক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।
- আল্লাহর অনেক চমৎকার গুণাবলি রয়েছে এবং তিনি সৃষ্টির মধ্যে এইসব গুণাবলি প্রকাশ করেন।
- আল্লাহ সীমাহিন সুন্দর, নির্ভুল ও যত্নশীল, তাই তার সৃষ্টি ও অত্যন্ত সুন্দর, নির্ভুল ও নিখুঁত এবং সুরক্ষিত।
- একজন শিল্পী যেমন সুন্দর ছবি এঁকে তার প্রতিভা প্রদর্শন করে, তেমনি আল্লাহও সৃষ্টিতে তার ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন।
- আল্লাহ এমন এক সুনিপুণ শিল্পী যিনি পূর্ব নমুনা ও বস্তু ছাড়াই সৃষ্টিতে সক্ষম এবং সৃষ্টিজগৎ হল তার সুন্দর শিল্পকর্ম।

ইতিহাসের গল্প
মরুচারী বেদুইন ও আল্লাহর অস্তিত্ব

এককালে মরুভূমির এক প্রান্তরে বাস করতো এক বেদুইন। সে তার উটগুলো নিয়ে মরুভূমিতে চষে বেড়াত ও এগুলোকে লালন পালনের মাধ্যমেই দিনরাত্রি কাটাতো। একদা বেদুইন গভীর রাতে কোন এক উপত্যকার পাশে খেজুর গাছের গোড়ায় আশ্রয় নিল। সে মুক্ত আকাশের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে। আকাশের বিশালতা ও সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করল। তার মনে হলো তারকাগুলো যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আর চাঁদের কিরণ তার মনে দিয়ে যাচ্ছে আনন্দের দোলা। সে তার মনের অজান্তেই বলে উঠলো: *"কতই না সুন্দর এই আকাশ এবং সৃষ্টি জগৎ!"*

ভোররাতে সূর্য ওঠার অনেক আগে সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো। প্রথমেই সে আল্লাহপাকের প্রশংসা এবং কীর্তন করলো। তারপর তার নিজের প্রতি আল্লাহ পাকের দেয়া নেয়ামতের স্বীকৃতি দান করতে লাগলো। সে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করছে আল্লাহ পাকের অগণিত ও অসংখ্য নিয়ামত সমূহ যা প্রতিনিয়ত সে উপভোগ করছে।

এভাবে তার প্রতিদিনই কেটে যেত। একদিন অবিশ্বাসীদের একটি দল তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তারা তার প্রার্থনা শুনে থমকে দাঁড়ালো। কোন একজন অবিশ্বাসী তাকে প্রশ্ন করেই বসলো, তুমি কিভাবে বুঝলে যে বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা আছেন? যাকে তুমি ডাকছো এবং যার কাছে প্রার্থনা করছো? জবাবে ধর্মপ্রাণ বেদুইন অত্যন্ত শান্তভাবে বললো,

"উটের বর্জ্য প্রমাণ করে উটের অস্তিত্ব। গাধার বর্জ্য জানায় গাধার অস্তিত্বের বার্তা। পায়ের দাগ বলে দেয় কেউ হেঁটে গেছে। তাহলে, গ্রহ-নক্ষত্র সজ্জিত

আকাশ, বিচিত্র রূপ ও সাজে সজ্জিত জমিন এবং তরঙ্গ কল্লোলিত সাগর প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ হবে না কেন ?"

সত্যিই যিনি চমৎকারভাবে আকাশকে সাজিয়েছেন, যিনি পৃথিবীকে এত সুন্দর ভাবে বসবাস উপযোগী করেছেন ও যিনি সাগরের বুকে এত বিপুল জলরাশির সমাবেশ ঘঠিয়েছেন তিনি হলেন আল্লাহ, বিশ্বজাহানের স্রষ্টা।

আল্লাহ বলেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

"*নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।*" - সূরা আলে ইমরান: ১৯০

এই গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্ন লিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক ও অভিভাবক শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন

- আল্লাহ তার সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন
- যদি এ বিশ্বের কোন সৃষ্টিকর্তা না থাকতেন, তাহলে কোন সৃষ্টি অস্তিত্বে আসতে পারতো না
- সকল মানুষই আল্লাহর সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তার অস্তিত্বের প্রমাণ পেতে পারে
- এমনকি মানব বসতি থেকে দূরে মরুভূমিতে কিম্বা একান্ত জঙ্গলে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তির পক্ষেও আল্লাহর সৃষ্টির খুলা বই পড়ে আল্লাহকে জানা ও চেনা সম্ভব

অনুশীলনী ৪

ক. সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর: সঠিক ঘরে ঠিক (✓) চিহ্ন দাও।

<u>সত্য</u> <u>মিথ্যা</u>

- ☐ ☐ বেদুইন লোকটি মরুভূমিতে গরু ছাগল চড়াতো
- ☐ ☐ একদা বেদুইন গভীর রাতে খেজুর গাছের গোড়ায় আশ্রয় নিল।
- ☐ ☐ বেদুইন ভোর রাতে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতো।
- ☐ ☐ সে তার জীবনে যা পেয়েছিল তাতে আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল।
- ☐ ☐ বেদুইন প্রশ্ন করল,তুমি কিভাবে বুঝলে যে বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা আছেন?
- ☐ ☐ পায়ের দাগ বলে দেয় কেউ হেঁটে গেছে।
- ☐ ☐ আল্লাহর বিশাল সৃষ্টি জগৎ আল্লাহর অস্তিত্বের বড় প্রমাণ।
- ☐ ☐ রাত্রি ও দিনের আবর্তনে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

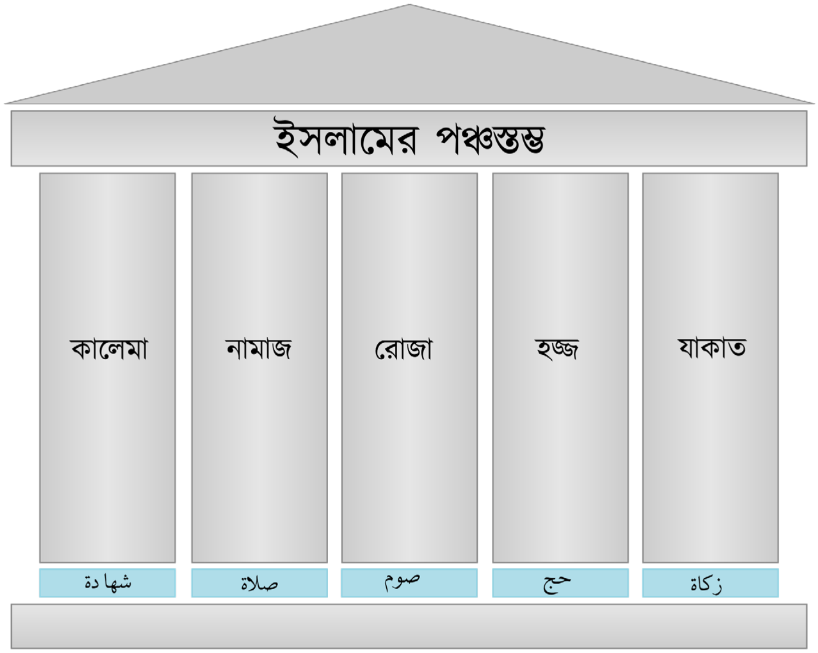

পাঠ ৩

ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে পারবে,

- *ইসলামের ভিত্তি হল পাঁচটি*
- *মুসলিম হতে হলে এ পাঁচটি কাজ একান্ত করণীয়*
- *এই পাঁচটি কাজ মুসলিম এবং অমুসলিম এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে*
- *সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ পালন খাঁটি বিশ্বাস ও আল্লাহর আনুগত্যের প্রমাণ*
- *এগুলো মুসলিম ব্যক্তিকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করতে প্রস্তুত করে*
- *জানতে হলে, অজানা বিষয়ে প্রশ্ন করতে হবে এবং জ্ঞানীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে*

ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি

ইসলাম মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান। জীবনে কখন কি করতে হবে ও কিভাবে করতে হবে ইসলাম তা বলে দিয়েছে। ইসলাম মেনে চললেই জীবন সুন্দর হয়। জীবন হয় শান্তিময়। কিছু বিধি-বিধান আছে একান্ত মৌলিক। এগুলোকে বলা হয় ইসলামের ভিত্তি। একটি ঘর নির্দিষ্ট কয়েকটি খুটা বা ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। তেমনি ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে পাঁচটি ভিত্তির ওপর। সেই পাঁচটি ভিত্তি হল:

১। **শাহাদাহ:** শাহাদাহ অর্থ সাক্ষ্য দেয়া। ঈমানের সাক্ষ্য দেওয়াকে শাহাদাহ বলা হয়। এই ঘোষণা দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। এই ঘোষণা ছাড়া কেউ মুসলিম গণ্য হবেনা।

২। **সালাত:** নামাজকে আরবিতে সালাত বলা হয়। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরজ। আর সেগুলো হল, ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা।

৩। **যাকাত:** ধনীদের অতিরিক্ত সম্পদের উপর যাকাত ফরজ। ধনীগণ (সাহিবে নেছাব) তাদের অতিরিক্ত সম্পদের ৪০ ভাগের একভাগ অভাবী ও গরীবদের যাকাত হিসাবে দিবে। বৎসরে একবার যাকাত আদায় করতে হবে।

৪। **সাওম:** সাওম অর্থ বিরত থাকা। ভোর সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার ও অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকা কে সাওম বা রোজা বলে। রমজান মাসে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য পূর্ণ মাস রোজা রাখা ফরজ।

৫। হজ: মক্কায় অবস্থিত কাবা ঘরকে তাওয়াফের মাধ্যমে হজ সম্পন্ন করতে হয়। ধনীদের জন্য জীবনে একবার হজ করা ফরজ।

بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإِقَامِ الصَّلَاةِ، وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি: 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই ও হজরত মুহম্মদ সা. আল্লাহ রাসূল' এ কথার সাক্ষ্য দেয়া, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ করা এবং রমজান মাসে রোযা রাখা। - বুখারী

অনুশীলনী ৫

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দাও।

১. ইসলাম পালন করলে জীবন ----------

o কষ্টকর হয়

o সুন্দর ও শান্তিময় হয়

o ঝামেলায় পড়ে

২. ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান গুলো হল ---------

o ইসলামের ভিত্তি

o ইসলামের ঘর

o ইসলামের শাখা

৩. ইসলামের ভিত্তি হলো -------

o পাঁচটি

o ছয়টি

o সাতটি

৪. শাহাদাহ অর্থ -------

o পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ

o ঈমানের ঘোষণা

o সত্য বলা

৫. ধনী কর্তৃক গরিবদের সাহায্য করাকে বলে -------

o যাকাত

o সাওম

o সালাত

৬. আমরা রমজান মাসে যে রোজা রাখি তাকে বলা হয় -------

- সাওম
- হজ
- শাহাদাহ

৭. মুসলমানের উপর প্রতিদিন ------- নামাজ ফরজ।

- ছয় ওয়াক্ত
- পাঁচ ওয়াক্ত
- সাত ওয়াক্ত

খ. রং কর

شهادة صلاة

زكاة حج

صوم

গ. শব্দ সার্কেল হতে শব্দগুলো চিহ্নিত করো।

পাঁচ স্তম্ভ শাহাদাহ যাকাত সালাত হজ্জ সাওম ইসলাম তিন

শিক্ষক ও অভিবাকদের জন্য

(ছাত্র /ছাত্রীদের কাছে সহজ করে ব্যাখ্যা করবেন)

ইসলাম ও ঈমান

- ভিত্তি ছাড়া যেমন ভবন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না তেমনি ইসলামের ভিত্তি ছাড়াও ইসলাম টিকে থাকতে পারে না।
- যে মুসলিম ইসলামের এই মৌলিক বিধি-বিধান গুলো মেনে চলেনা তার জন্য মুসলমান থাকা কঠিন হয়ে পড়ে।
- ইসলামের এই মৌলিক বিধি-বিধানগুলো সঠিকভাবে মেনে চললে, অন্যান্য বিধি-বিধান পালন করা খুবই সহজ হয়।
- যে ব্যক্তি ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধানগুলোকে অবহেলা করে তার ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে।

হাদিসের গল্প
জিব্রীল আ. ও ইসলাম

মহানবী মুহাম্মদ সা. সাহাবাদের নিয়ে মসজিদে নববীতে বসে আছেন। হঠাৎ এক অপরিচিত লোক এসে মসজিদে প্রবেশ করলো। সাহাবীদের কেউই তাকে চিনেন না। আবার লোকটি যে দূর দেশ থেকে এসেছে তার কোন আলামত ও পাওয়া যাচ্ছে না। তার পরনে ধবদবে সাদা পরিষ্কার পোশাক। পরিপাটি আঁচড়ানো কালো চুল। মনে হচ্ছে যেন আশে পাশের কোথাও থেকে লোকটি এসেছে। তাকে দেখে সাহাবীরা বিস্মিতই হয়েছিলেন।

এরপর লোকটি নবীজির খুব কাছে চলে এলো। নবীজির হাঁটুর সাথে নিজের হাঁটু লাগিয়ে বসলো। তার উরুতে দুহাত রেখে অত্যন্ত আন্তরিকতার পরিচয় দিল। লোকটি নবীজিকে জিজ্ঞেস করল, *"আচ্ছা বলুন তো, ইসলাম কী ?"*

উত্তরে নবীজি শান্তভাবে বললেন, *"ইসলাম হল, তুমি একথা ঘোষণা করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সা.ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল। এই ঘোষণার পর তুমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে, তুমি তোমার সম্পদের যাকাত দেবে, রমজান মাস আসলে তুমি রোজা রাখবে এবং বায়তুল্লায় (আল্লাহর ঘর, কা'বায়) গিয়ে হজ সম্পাদন করবে।"*

লোকটি বলল, *"আপনি ঠিকই বলেছেন।"*

তার এ কথা শুনে সাহাবীরা আরো বিস্মিত হলেন। যে প্রশ্ন করল, সেই আবার উত্তর শুনে বলে, ঠিকই বলেছেন। এরপর লোকটি আরো কিছু প্রশ্ন করলো। নবীজি তার সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন। কিন্তু প্রতি বারই উত্তর শুনে লোকটি বললো আপনি ঠিকই বলেছেন।

অতঃপর অপরিচিত লোকটি চলে গেল। সাহাবীদের মন চাচ্ছিলো লোকটি সম্পর্কে জানতে। কিন্তু তারা নবীজিকে জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছিলেননা। নবীজি সাহাবীদের মনোভাব বুঝতে পারলেন। তিনি সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, *"তোমরা কি জানো এই লোকটি কে?"*

তারা ভদ্রভাবে বললেন, *"আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালো জানেন।"*

তখন রাসূলে কারীম সা. বললেন, *"তিনি ছিলেন ফেরেশতা জিব্রীল। তিনি এসেছিলেন তোমাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দিতে।"* [২]

২. *বুখারী ও মুসলিম, হাদিস জিব্রীল*

এই গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্ন লিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক ও অভিভাবক শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন

- জনসমাবেশ সকলের জন্যই উন্মুক্ত থাকবে, এমনকি অপরিচিত লোকের জন্যও
- প্রশ্ন করা জানার একটি অন্যতম মাধ্যম
- মানুষকে কোন কিছু জানতে আগ্রহী করে তোলার জন্য প্রথমেই তার মধ্যে উৎসাহ তৈরি করা উচিত
- মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা শিক্ষা গ্রহণের জন্য অন্যতম একটি বিষয়
- প্রশ্ন করা, দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে সাহায্য করে
- মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ফেরেশতাদেরকেও পাঠানো হতো
- ফেরেশতারা প্রয়োজনে পুরুষের আকৃতি ধারণ করে থাকেন। তবে কখনো তারা কোন মহিলার আকৃতি ধারণ করেন না

অনুশীলনী ৬

ক. নিচের পাঁচটি পিলারে ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির নাম লিখ।

খ. ডান পাশের শব্দের সাথে বাম পাশের শব্দ মিলাও।

সাওম	পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ
ইসলাম	রমজান
যাকাত	পাঁচ স্তম্ভ
হজ্জ	গরিদের সাহায্য
শাহাদাহ	কাবা
সালাত	সাক্ষ্য

গ. একই ধরনের চিত্রগুলোকে লাইন দিয়ে সংযুক্ত করো অতঃপর প্রতিটি জোড়ায় ভিন্ন ভিন্ন রং দাও।

সালাত শিক্ষা দেয়

আল্লাহর একত্ববাদ ও নবুয়ত

ঈমান শিক্ষা দেয়

পরহেজগারী এবং শৃঙ্খলা

হজ্জ শিক্ষা দেয়

সহানুভূতি ও দানশীলতা

সাওম শিক্ষা দেয়

আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহকে স্মরণ করা

যাকাত শিক্ষা দেয়

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবন

আখলাক
(নৈতিক চরিত্র)

নৈতিকতা ও ইসলাম

ইসলামে নীতি নৈতিকতা ও চারিত্রিক মাধুর্যের মূল ভিত্তি হচ্ছে কতিপয় মৌলিক বিশ্বাস ও নীতিমালা। এসব বিশ্বাস ও নীতিমালার মধ্যে অন্যতম হলো:

১। আল্লাহ হচ্ছেন মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এবং সকল সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের মূল উৎস।

২। মানুষ হলো পৃথিবীতে আল্লাহর সম্মানিত, দায়িত্ববান ও আত্মমর্যাদাশীল প্রতিনিধি

৩। আল্লাহ আসমান ও জমিনের সব কিছুকে মানবকল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

৪। মানুষের প্রতি আল্লাহর দয়ার অংশ হিসেবে আল্লাহ মানুষের প্রতি এমন কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেননি যা তার সাধ্যের বাইরে।

৫। আল্লাহ মানুষের জন্য এমন কোন কাজ নিষিদ্ধ করেননি যা তার জন্য কল্যাণকর, আবার এমন কোন জিনিস তার জন্য বৈধ করেননি যা তার জন্য অকল্যাণকর।

৬। ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ও বাস্তবতার আলোকে জীবন পরিচালনাকেই উন্নত চরিত্রের আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৭। সকল জিনিসই মানুষের জন্য অনুমোদিত, কেবল তা ব্যতীত যা আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছে আর যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। তবে ইবাদতের ক্ষেত্রে কেবল তাই গ্রহণযোগ্য যা করতে বলা হয়েছে। বাকি সবই পরিত্যাজ্য।

৮। মানুষ তার সকল কাজের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য আর এজন্যই মানব জীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা।

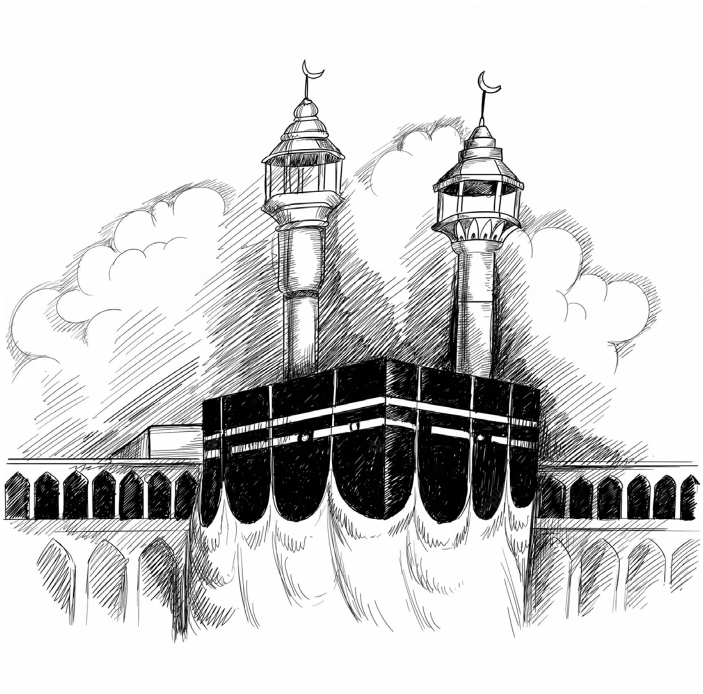

পাঠ ১

আল্লাহর প্রতি সম্মান

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে পারবে,

- *আল্লাহর প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানোর নিয়মনীতিগুলো গুলো কি কি*
- *আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন মানে তাঁর সমস্ত পবিত্র প্রতীকের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশেষত পবিত্র কুরআন কে সম্মান করা*
- *কুরআন কে এমনভাবে পড়া যাতে আমাদের হৃদয় আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে*
- *আল্লাহ তাকে সম্মান ও সফলতা দান করেন যে তাঁর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে*
- *ধার্মিক মুসলিম পৃথিবীতে আল্লাহর সবচেয়ে পবিত্র প্রতীক, তাই তাকে অবশ্যই সম্মান দেখতে হবে*
- *একজন মুসলমান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বদা তার নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও ভালোবাসা ত্যাগ করে*

আল্লাহর প্রতি সম্মান

আমরা অবশ্যই আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক আল্লাহকে সম্মান করি। আমরা আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে। তিনি আমাদেরকে যা কিছু আদেশ করেছেন আমরা তা শ্রদ্ধাভরে পালন করি। আর তিনি আমাদেরকে যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন আমরা তা পরিহার করি।

আমরা আল্লাহর নাম সম্মানের সাথে উচ্চারণ করে থাকি। আল্লাহর সম্মানে আমরা মন্দ কাজ পরিহার করি। কারণ, তিনি সব কিছুই দেখেন। আল্লাহর সম্মানে আমরা মুখে কোন মন্দ শব্দ উচ্চারণ করি না। কারণ, তিনি সবকিছু শুনেন।

আমরা আল্লাহর কিতাবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি। কোরআনকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে তেলাওয়াত করি। কোরআনের বাণীগুলো মনোযোগ সহকারে ও খুশি মনে শুনি। কোরআন বুঝে পড়ি ও কোরআনের শিক্ষাগুলো বাস্তব জীবনে মেনে চলি।

আমরা আল্লাহর ঘর মসজিদকে সম্মানের সাথে ব্যবহার করি। আল্লাহর ঘরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি ও তাতে অযথা চেঁচামেচি করিনা। মসজিদে এমন কোন আচরণ করি না যা আল্লাহ অপছন্দ করেন। সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রমাণ করি।

অনুশীলনী ৭

ক. ঘরে রক্ষিত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

প্রতিপালক	মসজিদ	মন্দকাজ	অপছন্দ	ভক্তির
শুনেন	বাস্তব	ভালবাসা	আনুগত্য	

- আমরা অবশ্যই আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও -------- আল্লাহকে সম্মান করি।
- আমরা আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি তার প্রতি ------প্রদর্শনের মাধ্যমে।
- আল্লাহর প্রতি সম্মানের অংশ হিসেবে আমরা --------- পরিহার করি।
- আমরা মুখে কোন মন্দ শব্দ উচ্চারণ করি না। কারণ, আল্লাহ সবকিছু -------।
- আমরা আল্লাহর কিতাব কোরআনকে শ্রদ্ধা ও ------- সাথে তেলাওয়াত করি।
- কোরআন বুঝে পড়ি ও কোরআনের শিক্ষাগুলো --------জীবনে মেনে চলি।
- আমরা আল্লাহর ঘর --------- কে সম্মানের সাথে ব্যবহার করি।
- মসজিদে এমন কোন আচরণ করি না যা আল্লাহ --------- করেন।

খ. নিচের বাক্যটি তিনবার লিখ।

“আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে আমরা তার প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রমাণ করি।”

১. ---

----

২. ---

----

৩. ---

হাদিসের গল্প
কোরআনের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা

আবু তালহা রা. ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ও আল্লাহ প্রেমিক সাহাবী। মদীনার আনসারগণের মধ্যে তিনি বেশ ধনীও ছিলেন। আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসা ছিল সবকিছুর ঊর্ধ্বে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তিনি তার প্রিয় সম্পদ অকাতরে দান করতেন। মসজিদে নববী সংলগ্ন তার একটি বাগান ছিল।

'বীরহা' নামে একটি কূপ ছিল সেই বাগানে। রাসূলুল্লাহ সা. মাঝেমাঝে এ বাগানে যেতেন এবং বীরহা কূপের পানি পান করতেন। এ কূপের পানি ছিল খুবই মিষ্টি এবং তিনি তা খুব পছন্দ করতেন। আবু তালহা রা. এর বাগানটি ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। তার বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে এটা ছিল তার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তিনি একদা জানলেন যে, আল্লাহ আয়াত নাজিল করেছেন, যাতে বলা হয়েছে,

"তোমরা তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু আল্লাহর জন্য ব্যয় না করা পর্যন্ত প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা।" - সূরা আল ইমরান: ৯২

আল্লাহর কিতাবের প্রতি তার ছিল অসাধারণ সম্মান ও অকৃত্রিম ভালোবাসা। তিনি কোরআনের শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে সদা ছিলেন সচেষ্ট। তাই তিনি কাল বিলম্ব না করে রাসূলুল্লাহ সা. এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, *"আমার সব বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে বীরহা কূপের বাগানটি আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আমি এটি আল্লাহর পথে ব্যয় করতে চাই। অর্জন করতে চাই আল্লাহর ভালোবাসা। হতে চাই আল্লাহর প্রিয়জন। আপনি যে কাজে পছন্দ করেন, এটি তাতেই খরচ করুন।"*

রাসূল সা. বললেন, “*বিরাট মুনাফার এ বাগানটি আমার মতে তুমি স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দাও।*” আবু তালহা রাসূলুল্লাহ সা. এর পরামর্শ অনুযায়ী নিজ আত্মীয়দের মধ্যে বাগানটি ভাগ করে দিলেন।[৩]

আবু তালহা রা. এর ভালোবাসা ছিল নিখাদ। এ ভালোবাসা ছিল আল্লাহর ও তার কিতাবের জন্য। আল্লাহর কিতাবের শিক্ষাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে তিনি তার ভালোবাসার প্রমাণ দিলেন।

---

৩. *বুখারী ও মুসলিম*

এই গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্ন লিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক ও অভিভাবক শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন

১। সাহাবীদের মধ্যে সকলের দ্বীনদারীর মান সমান ছিল না। তাদের কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

২। ধন সম্পদের অধিকারী হওয়া পরহেজগারী ও দ্বীনদারীর প্রতিবন্ধক নয়।

৩। আল্লাহর জন্য নিজের সহায়-সম্পদকে ব্যয় করতে পারা ব্যক্তির দ্বীনদারীর অন্যতম একটি প্রমাণ।

৪। ঈমানদার ব্যক্তির কাছে আল্লাহর ভালোবাসা হবে দুনিয়ার সব ভালবাসার চেয়ে ঊর্ধ্বে।

৫। রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবীদের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি তাদের বিষয় সম্পত্তি দেখতে যেতেন।

৬। সাহাবীগণ তাদের মনের আবেগ উচ্ছ্বাসের কথা নবীজির কাছে মন খুলে বলতেন।

৭। কোরআনের প্রতি সাহাবীদের ভালোবাসা ছিল অগাধ। তারা তাদের কাজের মাধ্যমে তা প্রমাণ করতেন।

৮। কোরআনের কোন আয়াত নাযিল হলে সাহাবীগণ তা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দিতেন।

৯। সওয়াবের কাজগুলো কিভাবে করতে হবে তা সাহাবীগণ নবীজির কাছ থেকে জেনে নিতেন।

১০। দরিদ্র আত্মীয়গণ কে দান করলে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার সওয়াব ও সদকার সওয়াব উভয়ই পাওয়া যায়।

অনুশীলনী ৮

ক. নিচের শব্দ গুলো দিয়ে এক একটি বাক্য তৈরি কর।

- ভালোবাসা : --
- সাহাবী : --
- বীরহা কূপ : --
- ঊর্ধ্বে : --
- সর্বাপেক্ষা : --

খ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দাও।

১. আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন ---------------------

o মুহাজির সাহাবী
o আনসার সাহাবী
o ধনী তাবেয়ী

২. রাসূলুল্লাহ সা. মসজিদ সংলগ্ন যে কূপের পানি পান করতেন তা হল ---------

o বীরহা
o তালহা
o সানহা

৩. যে আয়াতটি আবু তালহা রা. কে দান করতে উদ্ধুদ্ধ করেছিল তা আছে সূরা -----------

o আল ইমরানে
o সূরা বাকারায়
o সুরা ইয়াসিনে

৪. আবু তালহা রা. তার বাগানটি দান করেছিলেন --------------

o নবীজির ভালোবাসায়

o আল্লাহর ভালোবাসায়

o আত্মীয়-স্বজনের ভালোবাসায়

৫. দানকৃত বাগানটি ভাগ করে দেয়া হয়েছিল --------------------

o আত্মীয়দের মাঝে

o পাড়া প্রতিবেশীর মাঝে

o মদিনার মিসকিনদের মাঝে

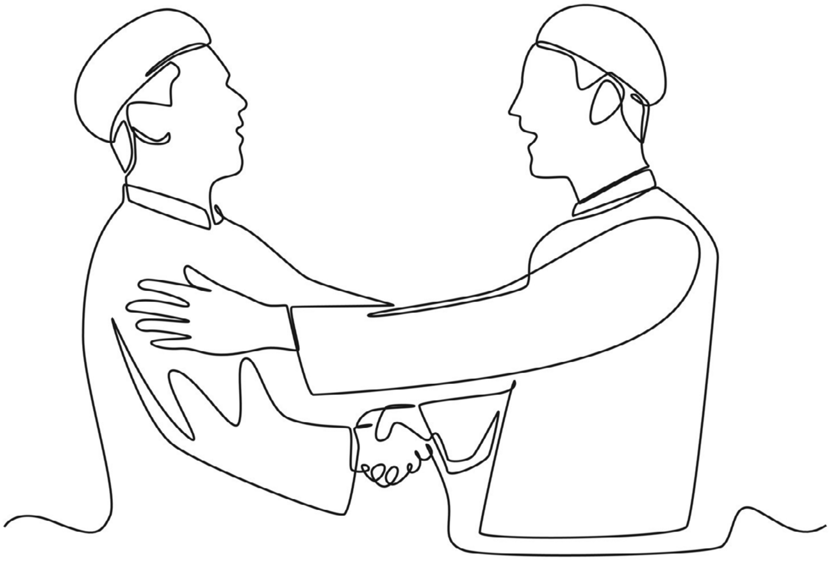

পাঠ ২

মানবজাতির প্রতি সম্মান

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে পারবে,

- *অন্যের প্রতি সম্মান দেখানোর ব্যাপারে ইসলামী কি বলে*
- *আমরা সকলেই এক আল্লাহর বান্দা এবং সকলেই একই পিতা আদমের সন্তান*
- *অন্যের প্রতি সম্মান, ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ দেখানো ইসলামের অন্যতম শিক্ষা*
- *সকল মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব-কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত*
- *সকলেরই অনুভূতি আছে এবং আছে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ পাওয়ার অধিকার*
- *আমরা অন্যের প্রতি সে আচরণই করব, যে আচরণ আমরা অন্যের কাছ থেকে আশা করি*

মানবজাতির প্রতি সম্মান

আল্লাহ মানবজাতির স্রষ্টা ও প্রতিপালনকারী। মানুষ আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আমাদেরকে অবশ্যই সকল মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

আল্লাহ পুরুষ ও নারী উভয়কে সৃষ্টি করেছেন। দুর্বল এবং সবল সকলেরই স্রষ্টা তিনি। ধনী ও গরীব উভয়ই তার সৃষ্টি। আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, বর্ণ এবং আকার আকৃতি দিয়ে।

সকল মানুষই হচ্ছে প্রথম মানব মানবী আদম ও হাওয়ার সন্তান। আমরা সকলেই একে অন্যের ভাই এবং বোন। গায়ের রং, মুখের ভাষা ও দেশ ভিন্ন ভিন্ন হলেও আমরা সকলেই মানুষ।

সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা, চাই সে আল্লাহকে স্বীকার করুক বা না করুক। সকল মানুষই আল্লাহর কাছে মানুষ হিসেবে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। আমাদের সকলকেই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তবে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি সম্মানী তারা যারা আল্লাহ কে ভয় করে চলে।

অনুশীলনী ৯

ক. নিচের কাজগুলির মধ্যে কোনটি সম্মান দেখানো এবং কোনটি অসম্মান দেখানো ? সঠিক ঘরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

	সম্মান দেখানো	*অসম্মান দেখানো*
দুর্বলকে সাহায্য করা		
শারীরিক প্রতিবন্ধী কে নিয়ে হাসা		
অন্যকে গালমন্দ করা		
স্বার্থপরতা দেখানো		
অন্যের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হওয়া		
অপরিচিত ব্যক্তির কুশলাদি জানা		
অন্যকে তাচ্ছিল্য করা		

খ. সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর: যথাযথ ঘরে ঠিক (✓) চিহ্ন দাও।

<u>সত্য</u> <u>মিথ্যা</u>

☐ ☐ আল্লাহ হচ্ছেন মানবজাতির স্রষ্টা।

☐ ☐ ফেরেশতাগণ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

☐ ☐ আমরা কেবল মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করব।

☐ ☐ সকল মানুষ আদম ও হওয়ার সন্তান।

☐ ☐ আল্লাহর কাছে মানুষ হিসেবে সকলেই সমান।

☐ ☐ আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে।

☐ ☐ বর্ণ ও ভাষার কারণে মানুষের সম্মানে পার্থক্য হয়।

গ. সূরা হুজরাত এর ১৩ নম্বর আয়াতটির অর্থ নিচে লিখ।

(কোরআনের একটি বাংলা অনুবাদ নিয়ে তা বের করার চেষ্টা কর)

ইতিহাসের গল্প

মুসলিম খলিফার মহানুভবতা

রাসূলুল্লাহ সা. এর ইন্তেকালের পর ন্যায়পরায়ণ মুসলিম শাসকগণ রাজ্য চালাতেন। তারা প্রায় অর্ধ বিশ্বকে শাসন করেছিলেন দীর্ঘকাল। বিশ্বের সর্বত্র তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অনেক বেশি। ধনসম্পদের দিক থেকেও মুসলমানরা পিছিয়ে ছিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলিম শাসকরা অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন।

উমর ইবনে আব্দুল আজিজ ছিলেন সেই ন্যায়পরায়ণ শাসকদের একজন। তাকে ইসলামের পঞ্চম খলিফা গণ্য করা হয়। তিনি ইসলামের প্রথম চার খলিফার শিক্ষাকে অনুসরণ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। তার খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আষাক ও বিছানাপত্র ছিল সাধারণ নাগরিকের মত।

গ্রীষ্মের এক রাতে অধিক গরমে খলিফার ঘুম আসছিল না। তিনি তার এক দাসীকে ডেকে বললেন, *“আচ্ছা, তুমি কি আমাকে একটু বাতাস করতে পারবে? গরমে কিন্তু আমার ঘুম আসছে না। আল্লাহ তাকে ভালবাসেন ও পুরস্কৃত করেন যে অন্যকে একটু শান্তির ব্যবস্থা করে দেয়।”*

দাসীটি খুশি মনে খলিফাকে বাতাস করতে লাগলো। এক পর্যায়ে খলিফা শান্তির সাথে ঘুমিয়ে পড়লেন।

খলিফা ঘুমিয়ে পড়েছেন দেখে দাসীটি আনন্দ অনুভব করলো। কিন্তু খলিফাকে বাতাস করতে করতে এক পর্যায়ে তার চোখে ঘুম এসে গেল। তার হাত থেকে হাতপাখাটি পড়ে গেল। দাসীটি ঘুমিয়ে পড়ায় বাতাস দেয়া বন্ধ হয়ে গেল। খলিফা আবারো গরম অনুভব করলেন। এতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

ঘুম ভেঙ্গে তিনি দেখলেন, তার দাসীটি ঘুমিয়ে পড়েছে। খলিফা দাসীর শরীরে ঘাম দেখতে পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, দাসীটি গরমে কষ্ট পাচ্ছে যদিও সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই খলিফা পাখাটি হাতে নিয়ে দাসীকে বাতাস করতে লাগলেন। দাসী অত্যন্ত আরামের সাথে ঘুমোতে থাকল। খলিফা তার গভীর ঘুম দেখে তৃপ্তি অনুভব করছিলেন আর অব্যাহতভাবে তাকে বাতাস দিয়ে যাচ্ছিলেন।

এক পর্যায়ে খলিফার হাতপাখার শীতল বাতাস দাসীর গালে লাগতেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে উঠে দাসী দেখল, খলিফা তাকে বাতাস করছেন। তার চেহারায় লজ্জার ভাব আসলো। খলিফা তা বুঝতে পারলেন। খলিফা মুচকি হেসে বললেন, "*এই ভেবে তুমি আশ্চর্য হচ্ছো যে, মুসলিম বিশ্বের খলিফা তোমাকে বাতাস করছেন।*" খলিফা তাকে শান্ত ভাবে বললেন, "*মানুষ হিসাবে আমরা সকলেই আল্লাহর কাছে সমান। শান্তি ও স্বস্তি সকলেরই সমানভাবে প্রয়োজন। ইসলামে রাজা-প্রজা ও দাস-মনিবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমরা সকলেই আল্লাহর বান্দা আর আমাদের সকলকেই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।*"

এই গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্ন লিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক ও অভিভাবক শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন

- আমাদের ধনী-গরিব ও রাজা-প্রজা সকল মানুষের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে,
- সব মানুষেরই আছে সুখ দুঃখের অনুভূতি, তাই সকলের সাথে সম্মান, ভালবাসা দেখতে হবে
- আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা অন্যদের জন্য শান্তি এবং স্বস্তির ব্যবস্থা করে
- আমরা নিজেদের ব্যাপারে যেমন যত্নশীল হই তেমনি চাকর বাকর ও সেবিকাদের ব্যাপারেও যত্নশীল হবো
- যেরূপ আচরণ পেতে আপনি পছন্দ করেন, অন্যদের সাথে আপনার আচরণ তেমন হওয়া উচিত
- আমরা সবাই আল্লাহর বান্দা। আল্লাহর দৃষ্টিতে আমরা সবাই সমান
- রাজা এবং শাসকগণ জনগণের সেবক। বিলাসী জীবন যাপন তাদের অনুচিত
- শাসকদের অবশ্যই তাদের জনগণের প্রতি দয়ালু হওয়া উচিত। অহেতুক কটুর হওয়া উচিত নয়

অনুশীলনী ১০

ক। ডান পাশের বাক্যাংশের সাথে বাম পাশের বাক্যাংশ মিলাও।

বাম পাশ	***ডান পাশে***
মুসলিম শাসকরা প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও	মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।
ইসলামের পঞ্চম খলিফা ছিলেন	"আচ্ছা, তুমি কি আমাকে একটু বাতাস করবে"?
ইসলামে রাজা-প্রজা ও দাস-মনিবের	দাসীকে বাতাস করতে লাগলেন।
খলিফা দাসীকে ডেকে বললেন,	উমর ইবনে আব্দুল আজিজ
এই ভেবে তুমি আশ্চর্য হচ্ছো যে,	অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন।
খলিফা পাখাটি হাতে নিয়ে	মুসলিম বিশ্বের খলিফা তোমাকে বাতাস করছেন।

পাঠ ৩

সৃষ্টি জীবের প্রতি সম্মান

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে পারবে,

- *সৃষ্ট জীব ও প্রাণীকুলের প্রতি আমাদের করণীয় সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কী*
- *আল্লাহর নিদর্শন সৃষ্ট জীব ও প্রাণীকুল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ঈমান বৃদ্ধিতে সহায়ক*
- *আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা আল্লাহর সৃষ্ট জীবকে সম্মান করতে শিখায়*
- *সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া ও সম্মান দেখতে মহানবী সা. সাহাবীদের নির্দেশ দিতেন*
- *জীব জন্তু ও পশু পাখিরাও আমাদের মতো ভয় ও দুঃখ অনুভব করে ও কখনো তা প্রকাশ করে*
- *আল্লাহর সৃষ্ট জীব কোনো না কোনো ভাবে আমাদের উপকারে আসে ও আমাদের কাজে লাগে*

সৃষ্টি জীবের প্রতি সম্মান

পৃথিবীতে বসবাসরত প্রতিটি প্রাণী এবং জীবজন্তু আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ তার সৃষ্টিকে ভালোবাসেন ও তাদের প্রতিপালন করেন। আল্লাহ তার সৃষ্টি প্রতিটি পশু পাখির মঙ্গল ও কল্যাণ চান।

আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তার সৃষ্টির সাথে উত্তম আচরণ করতে। আল্লাহ আমাদেরকে পৃথিবীতে তার খলিফা করে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তার খলিফা মানুষ কে সকল সৃষ্টির উপর ক্ষমতাও দান করেছেন। আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা দিয়ে আমরা সৃষ্টি জীবের উপকার করবো এবং তাদের যত্ন নেব।

প্রত্যেক সৃষ্টি আল্লাহর পরিবারভুক্ত এক একটি সদস্য। আমাদেরকে অবশ্যই সকল সৃষ্টি জীবের প্রতি সম্মান দেখতে হবে। সৃষ্টির প্রতি সম্মানের মাধ্যমে আমরা আল্লাহকে সম্মান করি ও তার প্রতি ভালোবাসা দেখাই।

অনুশীলনী ১১

ক. নিচের লাইনটি রং কর।

আমরা অবশ্যই
সকল সৃষ্ট জীবের
প্রতি সম্মান
প্রদর্শন করব

খ. নিচে প্রদত্ত তালিকা থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

উত্তম	আল্লাহর	সম্মান	খলিফা	উপকারে	ক্ষমতা	পরিবারভুক্ত

- পৃথিবীতে বসবাসরত প্রতিটি প্রাণী এবং জীবজন্তু --------- সৃষ্টি।
- আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন সৃষ্টির সাথে --------- আচরণ করতে।
- আল্লাহ আমাদেরকে পৃথিবীতে তার --------- করে পাঠিয়েছেন।
- আল্লাহ আমাদেরকে সকল সৃষ্টির উপর --------- দান করেছেন।
- আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা দিয়ে আমরা সৃষ্টি জীবের --------- করবো।
- প্রত্যেক সৃষ্টি আল্লাহর ---------- এক একটি সদস্য।
- আমাদেরকে সকল সৃষ্টি জীবের প্রতি ----------- দেখাতে হবে।

গ. নিচের প্রদত্ত শব্দ ধাঁধা থেকে শব্দগুলো খোঁজে বাহির করো এবং বৃত্ত দ্বারা চিহ্নিত কর।

বসবাসরত	ভালোবাসেন	কল্যাণ	আচরণ	পৃথিবীতে	খলিফা

ব	স	বা	স	র	ত	খ	ত	ণ	লি
ভা	লো	ভা	ল্যা	বী	ক	লি	ক	ত	চ
স	পৃ	লো	ব	ত	ন	ফা	বা	ল্যা	ন
বা	থি	বা	চ	আ	চ	র	ণ	বী	ণ
স	বী	সে	ভা	চ	আ	ত	ব	খ	ত
ফা	তে	ন	চ	প	রি	বা	র	ত	চ

হাদিসের গল্প
পশুর প্রতি মহানবীর দয়া

ইসলাম আগমনের আগে আরবরা পশুপাখির সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করতো। তারা জীবজন্তুদের নিশানা বানিয়ে হত্যা করত। তারা অনেক সময় এদের ঠিকমতো খাদ্য পানীয় দিত না। পশু পাখিদের সুস্থতার প্রতি তারা ভ্রুক্ষেপ করত না। গৃহ পালিত জন্তুর ওপর অতিমাত্রায় বোঝা চাপিয়ে দিত। এসব পশুদের পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশ্রামের সুযোগ দিত না। সারা দিন নির্দয়ভাবে খাটাত ও নির্মমভাবে শাস্তি দিত। এসব দেখে মুহাম্মদ সা. এর কোমল অন্তর কেঁদে উঠত। তাই নবী হয়ে তিনি এসব জঘন্যতম প্রথা দূর করার উদ্যোগ নেন। তিন তার অনুসারীদের সদা উপদেশ দিতেন আল্লাহর সৃষ্টি এসব জীব জানোয়ারের প্রতি সদয় ও কোমল হতে।

রাসূলুল্লাহ সা. সাধারণত আসর নামাজ আদায় করে সাহাবীদের বাগান দেখতে যেতেন। সেখানে সময় কাঠাতেন ও বাগানের ফল ও পানীয় উপভোগ করতেন। এর মাধ্যমে সাহাবীদের সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠতো।

রাসূলুল্লাহ সা. একদিন বিকাল বেলা এক আনসারি সাহাবীর খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন। তিনি সেখানে আনন্দঘন সময় কাঠাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন একটি উট বাগানে বিষন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। নবীজি উটটির কাছে গেলেন। উটটি নবী সা. কে দেখে কাঁদতে লাগল। নবীজি উঠটির কান্নার কারণ বুঝতে পারলেন। নবী হিসাবে আল্লাহ তাকে পশু পাখির দুঃখ বেদনা বুঝার জ্ঞান দিয়েছিলেন। তার চোখের পানি মহানবী সা. কে অনেক ব্যথিত করলো। তিনি কাছে গিয়ে উঠটির মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। এতে উটটির কান্না বন্ধ হয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, *“এ উটের মালিক কে?”* এক আনসারি

যুবক এসে বলল, "*হে আল্লাহর রাসূল! উটটি আমার।*" নবীজী সা. বললেন, "*আল্লাহ যে তোমাকে এই নিরীহ প্রাণীটির মালিক বানালেন, এর ব্যাপারে তুমি কি আল্লাহকে ভয় করো না? উটটি আমার কাছে অভিযোগ করেছে, তুমি একে ক্ষুধার্ত রাখো এবং কষ্ট দাও।*"[৪]

অন্য একদিন রাসূলুল্লাহ সা. একটি উটের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, প্রচুর ক্ষুধায় যার পিঠ পেটের সাথে লেগে গেছে। অনাহারে অপুষ্টিতে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এ দৃশ্য দেখে রহমতের নবীর ভীষণ মায়া হলো। সাহাবিদের ডেকে বললেন, "*এসব বাকশক্তিহীন প্রাণীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। এগুলোকে অহেতুক কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকো। সুস্থ অবস্থায় এগুলোতে আরোহণ করো, সুস্থ অবস্থায় আহার করো*"।[৫]

---

৪. সুনানে আবু দাউদ : ২৫৪৯
৫. আবু দাউদ : ২৫৪৮

এই গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্ন লিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক ও অভিভাবক শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন

- আসমানী শিক্ষার অভাব ও ঈমানহীন জীবন যাপন মানুষকে নিষ্ঠুরতা শিক্ষা দেয়
- আল্লাহর সৃষ্টি পশু পাখিদের অহেতুক কষ্ট দেওয়া আল্লাহর অবাধ্যতার শামিল
- জীবজন্তুর ও সুখ দুঃখের অনুভূতি আছে। তাদের প্রতি অতিরিক্ত বোঝা চাপানো জুলুম
- নবী মুহাম্মদ সা. ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন তথা সারা বিশ্বের জন্য রহমত
- শুধু মানুষ নয় বরং সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি নবী মুহাম্মদ সা. এর ছিল অপরিসীম দয়া
- মুহাম্মদ সা. তার সহচরদের খোঁজ খবর নিতে তাদের বাড়ি ও বাগানে বেড়াতে যেতেন
- আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে নবীগণ পশু-পাখিদের মনের ভাষা বুঝতে পারেন
- আল্লাহ যাদেরকে পশু পাখির মালিক করেন তাদের উচিত এগুলোর যথাযথ যত্ন নেয়া
- পশু-পাখিদের প্রতি অবহেলা ও তাদেরকে অহেতুক কষ্ট দেওয়া গুনাহের পর্যায়ে পড়ে
- একজন ব্যক্তির দ্বীনদারীর বড় প্রমাণ হলো সে সকল কাজে আল্লাহকে ভয় করে চলে

অনুশীলনী ১২

ক. নিচের সঠিক ঘরে ঠিক চিহ্ন দাও।

	সঠিক আচরণ	*ভুল আচরণ*
জীবজন্তুদের নিশানা বানিয়ে হত্যা করা		
পশু পাখিদের কম কষ্ট দিয়ে জবাই করা		
পশুদের পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোগ না দেওয়া		
পশুদের প্রয়োজনীয় খাদ্য না দেওয়া		
পশুদের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করা		
অসুস্থ পশুদের চিকিৎসা করানো		
বোঝা বহন করতে না পারলে পিঠানো		

ফিকহ
(ইসলামী আইনশাস্ত্র)

ইসলাম ও তাহারাত

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি শারীরিক স্বাস্থ্যের একটি প্রধান অংশ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেন: "*পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।*" তিনি অবশ্য জোর দেন, নিয়মিত গোসল ও অজু করা এবং মিসওয়াক ব্যবহারের উপর। তিনি এমন এক পরিবেশে তা বলেছিলেন যেখানে পানি পাওয়া ছিল দুঃসাধ্য।

পরিচ্ছন্নতা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি কে ইসলামে দ্বীনের এবং দৈনন্দিন রুটিনের অংশ করা হয়। টয়লেটে যাওয়ার পর গোপনাঙ্গ ধৌত করা মুসলিমের উপর অবশ্য করণীয়। শরীরের এমন অংশগুলি পরিষ্কার করাকে 'অজু'র অংশ করা যা সাধারণত ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় করা হয় না যেমন পা, নাক এবং কানের পিছন ধৌত করা।

অজু মুসলিম ব্যক্তিকে দিন রাত মিলে কমপক্ষে ৫ বার করতে হয় পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য। পরিচ্ছন্নতা রোগ সংক্রমণ ও বিস্তার রোধে প্রধান কার্যকরী পদক্ষেপ। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন এবং আপনি যতই দরিদ্র হোন না কেন, ইসলাম আপনাকে পরিষ্কার থাকতে এবং পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তুলতে নির্দেশ দেয়।

পাঠ ১

তাহারাত

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে পারবে,

- *ইসলামে তাহারাত বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পদ্ধতি ও তার গুরুত্ব*
- *আল্লাহ নিজে পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন*
- *আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ওহী ও পথ নির্দেশনা মুমিনদের আনন্দ, স্বস্তি ও শান্তি দেয়*
- *ফেরেশতারা পবিত্র এবং যেকোনো ধরনের অপবিত্রতা তাদের উপস্থিতিতে বেমানান*
- *আমাদের বসবাসের ঘরগুলো সর্বদা পবিত্র এবং জীবাণু মুক্ত থাকবে*
- *শারীরিক এবং আত্মিক পবিত্রতার মত অপবিত্রতাও শারীরিক এবং আত্মিক হয়ে থাকে।*
- *অপবিত্রতা আমাদেরকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করে*

তাহারাত

তাহারাত আরবি শব্দ। তাহারাত অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। তাহারাত মুসলিম ব্যক্তির জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইসলামে তাহারাত বলতে তিন ধরনের পবিত্রতা ও পরিছন্নতাকে বোঝায়। আর তা হলো:

১।আত্মা ও চিন্তার পরিচ্ছন্নতা: দুষ্ট চিন্তা হতে মুক্ত থেকে এবং মন্দ কাজ পরিহার করে আমরা আমাদের আত্মাকে পবিত্র রাখতে পারি।

২। শরীর ও পোষাকের পরিচ্ছন্নতা: নিয়মিত গোসল ও ধৌত করার মাধ্যমে আমরা আমাদের শরীর এবং পোশাককে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখতে পারি। যথাসময়ে নখ ও চুল কাটা শরীরের পরিচ্ছন্নতার অংশ।

৩। বাসস্থান ও পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা: বাড়ি ঘর ও আশপাশ পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে আমাদের উচিত আসবাবপত্র গুছিয়ে রাখা, যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা না ফেলা এবং নিয়মিত পরিচ্ছন্ন অভিযান চালানো।

শরীর ও পোশাক পবিত্র না হলে ফরজ সালাত আদায় করা সম্ভব নয় এবং কোরআন স্পর্শ করা ও উচিত নয়। তাই মুসলিম ব্যক্তিকে সর্বদা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

ফেরেশতাগণ পবিত্র। তাই তারা কেবল এমন ব্যক্তির কাছে আসেন যারা পবিত্র এবং পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করে। পবিত্র ব্যক্তিগন ফেরেশতাদের দুয়া লাভ করেন।

শয়তান অপবিত্র। তাই সে অপবিত্র ও অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তির কাছে আসে ও তাকে বিভ্রান্ত করে। আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা পবিত্রতা অবলম্বন করে এবং পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করে।

অনুশীলনী ১৩

ক. নিচের বাক্যটি তিনবার লিখ।

"আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করে।"

১. --

----

২. --

----

৩. --

খ. নিচের ঘরে রক্ষিত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

দুষ্ট	আবর্জনা	পবিত্রতা	ভালোবাসেন
পরিচ্ছন্ন	ফেরেশতাগণ	বিভ্রান্ত	নখ

- তাহারাত অর্থ হচ্ছে .... ও পরিচ্ছন্নতা।
- .... চিন্তা পরিহার করে আমরা আমাদের আত্মাকে পবিত্র রাখতে পারি।
- আমাদের উচিত, যত্রতত্র ময়লা ...... না ফেলা এবং নিয়মিত পরিচ্ছন্ন অভিযান চালানো।
- যথাসময়ে ...... ও চুল কাটা শরীরের পরিচ্ছন্নতার অংশ।

- মুসলিম ব্যক্তিকে সর্বদা পবিত্র ও .... থাকতে হবে।
- .... কেবল এমন ব্যক্তির কাছে আসেন যারা পবিত্র এবং পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করে।
- শয়তান অপবিত্র ও অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তির কাছে আসে ও তাকে .... করে।
- আল্লাহ তাদেরকে .... যারা পবিত্রতা অবলম্বন করে এবং পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করে।

গ. নিচের আরবি শব্দটি রং কর ও তার অর্থ লিখ।

طهارة

অর্থ লিখ:______________________

হাদিসের গল্প

ফেরেশতা ও অপবিত্র ঘর

একদা ফেরেশতা জিব্রিল আলাইহিস সালাম নবী মুহাম্মদ সা. কে বলেছিলেন যে, তিনি তার সাথে একটি নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে সাক্ষাৎ করবেন। নির্ধারিত সময়ে রাসূলুল্লাহ সা. জিব্রিল আ. এর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু জিব্রিল আ. সময় মত না আসাতে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

তিনি ঘরের ভিতর পায়চারি করছিলেন আর এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। এ অবস্থায় কি ঘটলো এ নিয়ে তিনি বেশ দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তার হাতে একটি লাঠি ছিল। বিষন্নতায় তিনি হাতের লাঠিটি ছুঁড়ে ফেললেন আর বলতে লাগলেন, *'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (জিব্রিল আ.) ওয়াদা ভঙ্গ করেন না'*। তিনি ঘরের এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন, আর খুজতেছিলেন ঘরে অপছন্দনীয় কিছু আছে কিনা ?

হঠাৎ দেখতে পেলেন তার খাটিয়ার নিচে একটি ছোট্ট কুকুরছানা। তিনি তার প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে প্রশ্ন করলেন, *"কখন এখানে কুকুর ছানাটি ঢুকেছে?"* তিনি জবাবে বললেন, *"আল্লাহর কসম আমি তা জানি না।"*

আসলে রাসূল সা. এর নাতি হাসান ও হুসাইন আদর করে কুকুর ছানাটি ঘরে নিয়ে এসেছিলেন। রাসূল সা. এর নির্দেশে তখনই কুকুর ছানাটি ঘর থেকে বের করা হলো। এর পরপরই জিব্রিল আ.লাইহিস সালাম এসে হাজির হলেন।

জিবরীল আলাইহিস সালাম কে দেখে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, *"আপনি আমাকে আসবেন বলেছিলেন আর আমি আপনার অপেক্ষায় বসে আছি কিন্তু আপনি তো নির্দিষ্ট সময় আসেননি।"* তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম বললেন,

"আমি সঠিক সময়ে এসেছিলাম। কিন্তু আপনার ঘরের ছোট্ট কুকুর ছানাটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি এমন ঘরে প্রবেশ করি না যে ঘরে কুকুর বা জীবজন্তুর ছবি আছে।" -মুসলিম

এই গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্ন লিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক ও অভিভাবক শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন

- জিব্রাইল আলাইহিস সালাম হচ্ছেন ওহীর ফিরিস্তা। আল্লার কাছ থেকে নবীর কাছে ওহী নিয়ে আগমন করেন
- একজন নবী কখনও আল্লাহর অবাধ্য হতে পারেন না আর ফেরেশতা কখনো তার ওয়াদা ভঙ্গ করেন না
- ওহী বা আল্লাহর পক্ষ হতে আগত প্রত্যাদেশ হচ্ছে শান্তি ও স্বস্তি পাওয়ার একটি মাধ্যম
- নবীর কাছে ওহী আগমন না করা তার অশান্তি ও উদ্বিগ্নতা বাড়িয়ে দেয়
- ফেরেশতা নূরের তৈরি এবং পূতপবিত্র। এমন কোন স্থানে তারা আগমন করেন না যেখানে পবিত্রতার কমতি আছে।
- ঘরে কুকুর রাখা অবৈধ কাজ। তবে শিকারী, পাহাদার বা পথ পদর্শক কুকুর পৃথক ঘরে রাখা জায়েজ।
- কুকুর ঘরে না রাখার অর্থ এই নয় যে কুকুরের প্রতি নির্দয় ও নিষ্ঠুর হতে হবে। বরং এ সৃষ্টির প্রতিও সদয় আচরণ করতে হবে।
- এক ব্যক্তি মৃত্যু পথযাত্রী তৃষ্ণার্থ একটি কুকুরকে পানি দিয়ে জীবন বাঁচিয়েছিল, আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে জান্নাতে দিলেন।
- ঘরে প্রাণীর ছবি ঝুলিয়ে রাখা ইসলামে নিষিদ্ধ। তবে চেহারা কর্তিত থাকলে দেয়াল ছাড়া ঘরের অন্য স্থানে রাখা যেতে পারে
- প্রাণীর ছবি অঙ্কন ইসলামে নিষিদ্ধ। শিক্ষা দানের নিমিত্তে ছবি অঙ্কন ও প্রদর্শন করা ও খেলার জন্য শিশুদের পুতুল দেয়া জায়েজ।
- যেখানে আল্লাহ পাকের নির্দেশের খেলাপ কিছু থাকে সেখানে ফেরেশতারা প্রবেশ করে না।
- দুর্গন্ধ ও ময়লা আবর্জনা যুক্ত ঘরে ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না। তবে আজাবের ফেরেশতারা যে কোন স্থানে প্রবেশ করেন।
- আর কোন কিছুই মৃত্যুর ফেরেশতাকে আটকে রাখতে পারে না। নির্দিষ্ট সময় এসে তিনি প্রাণ হরণ করবেনই।
- ওয়াদা রক্ষা করা জরুরী। তবে শরীয়ত সম্মত কারণে ওয়াদা খেলাফ হলে, অবশ্যই তা ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে।

অনুশীলনী ১৪

ক. ছবি ব্যবহার করে গোপন শব্দটি বাহির কর অতঃপর উক্ত শব্দ দিয়ে নিচের শূন্যস্থান পূরণ কর।

কি		ব		
আ		র		
কা		গা	র	
		ব	লা	

----------------মুসলিম জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এমনকি কেউ যদি মরুভূমিতে ও সামান্য পানি নিয়ে জীবন যাপন করে সেখানেও তাকে ----------------অবলম্বন করতে হবে।

নবী মুহাম্মদ সা. নিয়মিত গোসল করা, ওযু করা এবং মেসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। -------------- মুসলিম ব্যক্তির একটি ধর্মীয় দায়িত্ব। ------------- টয়লেটে যাওয়ার পর গোপন অঙ্গ ধৌত করাকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের পূর্বে নির্দিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধুয়ে ওযু করাকেও ----------------- বলে। রোগ জীবাণু থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম একটি মাধ্যম হলো ----------। একজন মুসলিম সে যতই গরীব হোক তাকে অবশ্যই ------------অবলম্বন করতে হবে।

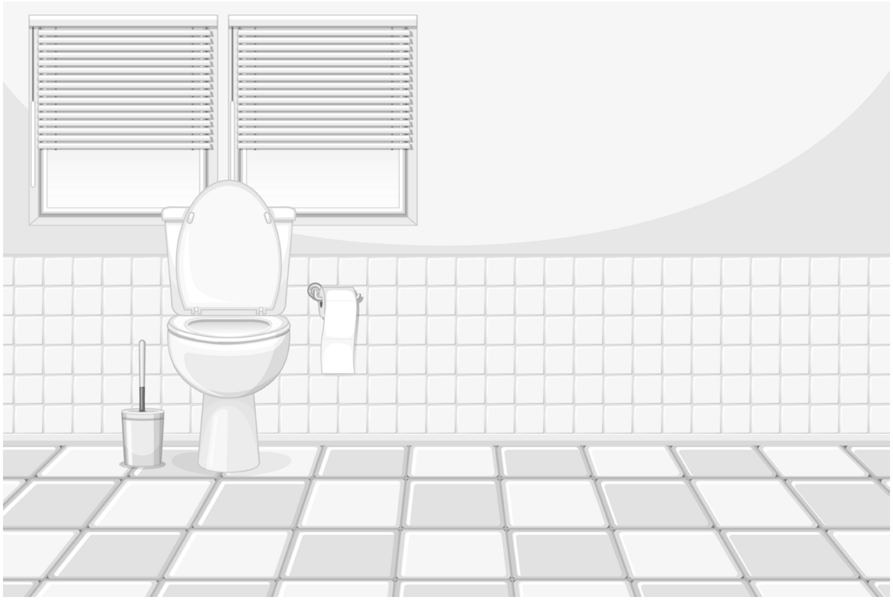

পাঠ ২

ইস্তিঞ্জা

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে পারবে,

- *ইস্তিঞ্জা বা টয়লেট সংক্রান্ত ইসলামী বিধি-বিধানগুলো কী কী এবং তা কিভাবে পালন করতে হয়*
- *স্বাস্থ্য রক্ষা সংক্রান্ত ইসলামী নিয়মনীতি এবং লজ্জাশীলতা রক্ষায় ইসলামী আদাব ও শিষ্টাচারসমূহ*
- *যত্রতত্র ও লোক সম্মুখে মলমূত্র পরিত্যাগ না করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা*
- *প্রস্রাব থেকে পরিধেয় বস্ত্রকে কেন ও কিভাবে পবিত্র রাখতে হবে*
- *মাঝে মধ্যে কবরস্থানে ভ্রমণ করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দুয়া করা মৃত ব্যক্তির শান্তি ও স্বস্তি আনে*
- *প্রস্রাব সংক্রান্ত বিষয়ে অবহেলা কবরে আজাবের কারণ হতে পারে*
- *কোন গোনাহের কাজকে ছোট মনে করতে নেই, যে কোন গোনাহই আজাবের কারণ হতে পারে*

ইস্তিঞ্জা

পেশাব-পায়খানার পর নির্দিষ্ট স্থান ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করাকে আরবীতে ইস্তেঞ্জা বলে। অন্য কথায় ইস্তেঞ্জা অর্থ হল গোপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা।

ইস্তিঞ্জার জন্য ব্যাবহৃত নির্দিষ্ট স্থানকে বলা হয় টয়লেট বা শৌচাগার। আমরা টয়লেট পেপার বা পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করতে পারি। তবে উভয়টি ব্যবহার করা উত্তম।

টয়লেট পেপার বা পানি পাওয়া না গেলে মাটির ঢেলা দিয়েও আমরা ইস্তিঞ্জা করতে পারি। যে ব্যক্তি পেশাব পায়খানার পর ইস্তেঞ্জা করে না সে আসলে অপবিত্র এবং অপরিচ্ছন্ন। অপবিত্র এবং অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তির কোন ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন না। অপবিত্র ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়।

ইসলামে ইস্তেঞ্জার নির্দিষ্ট কিছু আদব ও শিষ্টাচার আছে। ইস্তেঞ্জা ও টয়লেট ব্যবহারের শিষ্টাচার ও নীতিমালা নিম্নরূপ:

১. টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে নিচের দুয়া পড়া:

اللَّهُمَّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবা-ইস।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুষ্ট পুরুষ জ্বিন ও নারী জ্বিনের অনিষ্ট থেকে।

২. প্রথমে বাঁম পা দিয়ে শৌচাগারে প্রবেশ করবে।

৩. দাঁড়িয়ে মলমূত্র ত্যাগ না করে বসে করা।

৪. জনসম্মুখে ও খোলামেলা স্থানে মলমূত্র ত্যাগ না করা।

৫. মলমূত্র ত্যাগকালীন সময়ে টুপি বা ওড়না দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা।

৬. শৌচাগারে বসে কথা না বলা এবং কোন কিছু না পড়া।

৭. কিবলামুখী হয়ে না বসা অথবা কিবলাকে পিছনে রেখে না বসা।

৮. টয়লেট পেপার দিয়ে ময়লা স্থান পরিষ্কার করা। অতঃপর পানি দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করা। প্রয়োজনের সাবান ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বাম হাত ব্যবহার করা।

৯. অতঃপর গোপন অঙ্গকে টয়লেট পেপার দিয়ে শুকিয়ে নেয়া যেতে পারে। এতেও বাম হাত ব্যবহার করতে হবে।

১০. অতঃপর উভয় হাত পানি ও সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করা।

১১. তারপর টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় ডান পা আগে বের করা।

১২. সবশেষে টয়লেট থেকে বের হয়ে নিচের দুয়াটি পড়া:

غُفْرَانَكَ (الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ الْاَذَى وَعَافَانِيْ)

উচ্চারণ : গোফরানাকা (আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আজহাবা আন্নিল আজা ওয়া আফানি)

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনার কাছে ক্ষমা চাই। (সব প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য; যিনি ক্ষতি ও কষ্টকর জিনিস থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।')

১৩. রাস্তা ঘাটে, গাছের নিচে বা পানিতে মলমূত্র ত্যাগ না করা।

নোট: *মনে রাখবে, টয়লেট সংক্রান্ত কোন দুয়া টয়লেটের ভিতর পড়া যাবে না। টয়লেটের বাহিরে পড়তে হবে।*

অনুশীলনী ১৫

ক. নিচের ঘরে রক্ষিত উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

সাবান	খুলামেলা	শুকিয়ে	ডান	ওড়না	কথা	পানিতে

১. জনসম্মুখে ও ------- স্থানে মলমূত্র ত্যাগ না করা।

২. মলমূত্র ত্যাগ কালীন সময়ে টুপি বা ------ দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা

৩. টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় -------- পা আগে বের করা।

৪. উভয় হাত পানি ও ----- দিয়ে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করা।

৫. শৌচাগারে বসে ------ না বলা এবং কোন কিছু না পড়া।

৬. রাস্তা ঘাটে, গাছের নিচে বা -------- মলমূত্র ত্যাগ না করা।

৭. অতঃপর গোপন অঙ্গকে টয়লেট পেপার দিয়ে ------- নেয়া যেতে পারে।

খ. শৌচাগারে প্রবেশের ও বের হওয়ার দুয়া দুটি অর্থসহ মুখস্ত বল।

নোট: *দুয়া দুটি শিক্ষার্থীরা বিশুদ্ধভাবে শিখেছে কিনা শিক্ষক নিশ্চিত করবেন। দুয়া দুটি শিখার ও সদা ব্যবহার করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে দেবেন।*

হাদিসের গল্প
প্রস্রাবে অসতর্কতা ও কবরের শাস্তি

ইসলাম আসার আগে আরবের লোকেরা লজ্জাশীলতা কিংবা পাক পবিত্রতা সম্পর্কে কিছুই জানতো না। লোকেরা অনেক সময় জনসম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতো এবং এটাকে দোষের কিছুই মনে করত না। তাদের সৎ পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পাঠালেন। তিনি তাদেরকে ধীরে ধীরে লজ্জাশীলতা শিক্ষা দিতে লাগলেন। শিক্ষা দিতে লাগলেন কিভাবে পাক পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। তিনি তাদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দিতেন যেন একজন পিতা তার সন্তানদেরকে আদর করে শিক্ষা দেয়। তার শিক্ষায় এক সময় তারা দুনিয়ার সেরা উন্নত ও রুচিশীল জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

নবী মুহাম্মদ সা.ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাহিরে যেতেন তিনি সাথে করে তার ঢাল নিয়ে যেতেন। ঢালটি মাটিতে পুঁতে নিজেকে আড়াল করে তিনি মলমূত্র ত্যাগ করতেন। সেই সময়ে এমনটি কোন লোক সাধারণত করত না।

একদা নবীজিকে এভাবে আড়াল করে মলমূত্র ত্যাগ করতে দেখে কিছু গ্রামীণ আরব তাকে নিয়ে রীতিমতো হাসাহাসি শুরু করে দিয়েছিল। তাদের একজন বলেছিল, “*দেখো! দেখো! লোকটাকে। সে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারছে একজন মহিলার মত নিজেকে আড়াল করে।*” তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে কোন এক সুযোগে লোকদের উপদেশ দিতে লাগলেন এই বলে,

“*প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার এটাই তো উত্তম উপায়। নিজেকে পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন রাখার উত্তম পন্থা। হ্যাঁ, অতীতে কিছু আল্লাহ ওয়ালা লোক নিজেকে*

পবিত্র রাখতে খুবই যত্নবান ছিলেন। যদি কখনো তাদের কাপড়ের কোথাও প্রস্রাব লেগে যেত, তবে তারা কাপড়ের সেই অংশটুকু পর্যন্ত কেটে ফেলতেন যাতে প্রস্রাব লেগেছে। কারণ তারা জানতেন, আল্লাহ কেবল তাদেরকেই ভালোবাসেন যারা পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন থাকে”।

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম মাঝে মধ্যে কবরস্থান ভ্রমণ করতেন। মুসলিম কবর-বাসীদের জন্য মন খুলে দুয়া করতেন। মুসলিম ব্যক্তিদের জন্য তার ভালোভাবাস ছিল অতুলনীয়। কবরে ভ্রমণ ও তাদের জন্য দুয়া করা ছিল সেই ভালোবাসার বহির প্রকাশ।

একদা তিনি হেটে যাচ্ছিলেন দুটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে। হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তিনি তার পবিত্র দুটি হাত উপরে তুলে ধরলেন এবং দুয়া করতে লাগলেন। তিনি কাঁদছিলেন আর চোখের পানি তার সুন্দর গাল দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। অতঃপর তিনি গাছের একটি সবুজ ডাল এনে তাকে দু'টুকরো করে দুটি কবরের মধ্যে পুঁতে রাখলেন।

তিনি সাধারণত এমন করতেন না। তাই সাহাবীদের কেউ কেউ প্রশ্ন করে বসলেন, *“হে আল্লাহর নবী আমরা দেখলাম আপনি আজকে এমন কিছু করেছেন যা সাধারণত আপনি করেন না। আপনি কি বলবেন, কেন আপনি ঐ সবুজ গাছের ডাল এনে তাকে দু'টুকরো করে দুই কবরের মধ্যে পুঁতে রাখলেন?”*

নবী করিম সা. কাঁদোকাঁদো কণ্ঠে তাদেরকে জবাব দিলেন, *“এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। এ শাস্তির কারণ এটা নয় যে, তারা খুবই খারাপ লোক। তাদের এমন দুটি অপরাধে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, যেগুলোকে লোকেরা খুব তুচ্ছ অপরাধ মনে করে। তাদের একজন প্রস্রাব করার সময় সতর্ক থাকত না। ফলে পেশাবের ফুটা তার শরীর ও কাপড়ে লাগত। আর এ নোংরা শরীর ও অপবিত্র*

কাপড় নিয়ে সে চলাফেরা করত। আর আরেকজন ছিল চোগলখোর, যে এক জনের কথা অন্যের কাছে পৌঁছে দিতো। এভাবে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি করতো। যদিও কথাগুলো সত্য ছিল। কিন্তু এর মাধ্যমে সে বিবাদ সৃষ্টি করত। এ দুটি অপরাধের কারণে দুইজন ব্যক্তির কবরে শাস্তি হচ্ছিল। আমি আল্লাহর কাছে দুয়া করলাম আল্লাহ যেন তাদের শাস্তিকে কমিয়ে দেন যতক্ষণ পর্যন্ত ডালের দুটি অংশ সবুজ থাকে।" -বুখারী ও মুসলিম

এই গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্ন লিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক ও অভিভাবক শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন

- ইসলাম শালীনতা, পবিত্রতা ও স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মবিধি শিক্ষা দেয়
- একজন পিতা তার সন্তানকে যতখানি ভালোবাসে রাসূলুল্লাহ সা. তার উম্মতকে তার চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন।
- অন্যকে জীবন যাপনের সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া তার প্রতি ভালোবাসারই প্রমাণ
- উলঙ্গ হয়ে বা কারো সম্মুখে প্রস্রাব পায়খানা করা ইসলামে জায়েজ নেই।
- মানুষের সম্মুখে নির্লজ্জ হওয়া শুধু গুনাহের কাজই নয় বরং তা ব্যক্তিত্বহীনতার প্রমাণ
- সতর্ক হয়ে পেশাব করা যাতে পেশাবের ফোটা কাপড় কিম্বা শরীরে না লাগে
- কখনো পেশাবের ফোটা শরীর বা কাপড়ে লাগলে শরীর ধুয়ে নিতে হবে এবং কাপড় পরিবর্তন করে করতে হবে
- শরীর ও কাপড় থেকে অপরিচ্ছন্নতা দূর করার জন্য পানি ব্যবহার করাই যথেষ্ট
- আল্লাহ কেবল তাদের ভালোবাসেন যারা পূতপবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করে
- কবরস্থানে ভ্রমণ করা ও মৃতদের জন্য দোয়া করা নবীজির অন্যতম একটি সুন্নাত
- আল্লাহ তার নবীকে কবরবাসীর অবস্থা মাঝে মধ্যে জানিয়ে দিতেন। ফলে তিনি তাদের এমন অবস্থা দেখতেন যা আমরা দেখতে পারিনা
- কবরের জীবন থেকেই পরকালীন শাস্তি এবং পুরস্কারের সূচনা হয়
- কবর হয়তো জাহান্নামের একটি গর্ত না হয় জান্নাতের একটি বাগান হবে
- কবিরা গুনাহের পাশাপাশি ছগিরা গুনাহ থেকেও বিরত থাকা মুলিম ব্যক্তির কর্তব্য
- প্রস্রাব কালীন সময়ে অসতর্ক থাকা এবং চোগলখোরী এমন দুটি অপরাধ যার জন্য কবরে শাস্তি হবে
- কবরবাসীর জন্য দুয়া করলে, আল্লাহ সে দুয়ার কারণে কবরবাসীর আজাব কমিয়ে দিতে পারেন
- কবরে সবুজ গাছের ডাল রাখা সাধারণ সুন্নাহ নয়। এটা একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। তবে এমনটি কেউ করলে তাকে নিষেধ করা যাবে না।

অনুশীলনী ১৬

ক. উপযুক্ত ঘরে ঠিক চিহ্ন দাও।

	সঠিক পদ্ধতি	*ভুল পদ্ধতি*
টয়লেটের ভিতরে দোয়া পড়া		
ডান পা দিয়ে টয়লেটে প্রবেশ		
টয়লেট পেপার এবং পানি ব্যবহার করা		
দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা		
ডান হাতে ইস্তেঞ্জা করা		
ডান পা দিয়ে বের হওয়া		
টয়লেট থেকে বের হয়ে দোয়া করা		
ইস্তেঞ্জার পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়া		
জন সম্মুখে প্রস্রাব করা		
কাপড়ে পেশাব লাগতে দেয়া		
পানি না পেলে মাটির ঢেলা ব্যবহার		

খ. শিশুরা প্রায়ই টয়লেট চেপে রাখে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। অবশেষে তাড়াহুড়া করে টয়লেটে যায়। এটি একটি খারাপ অভ্যাস। ফলে প্রায়শই তাদের কাপড়ে পেশাব পায়খানা লেগে তা নষ্ট হয়। ছোট ছেলেকে সাহায্য কর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন টয়লেটে যেতে পারে।

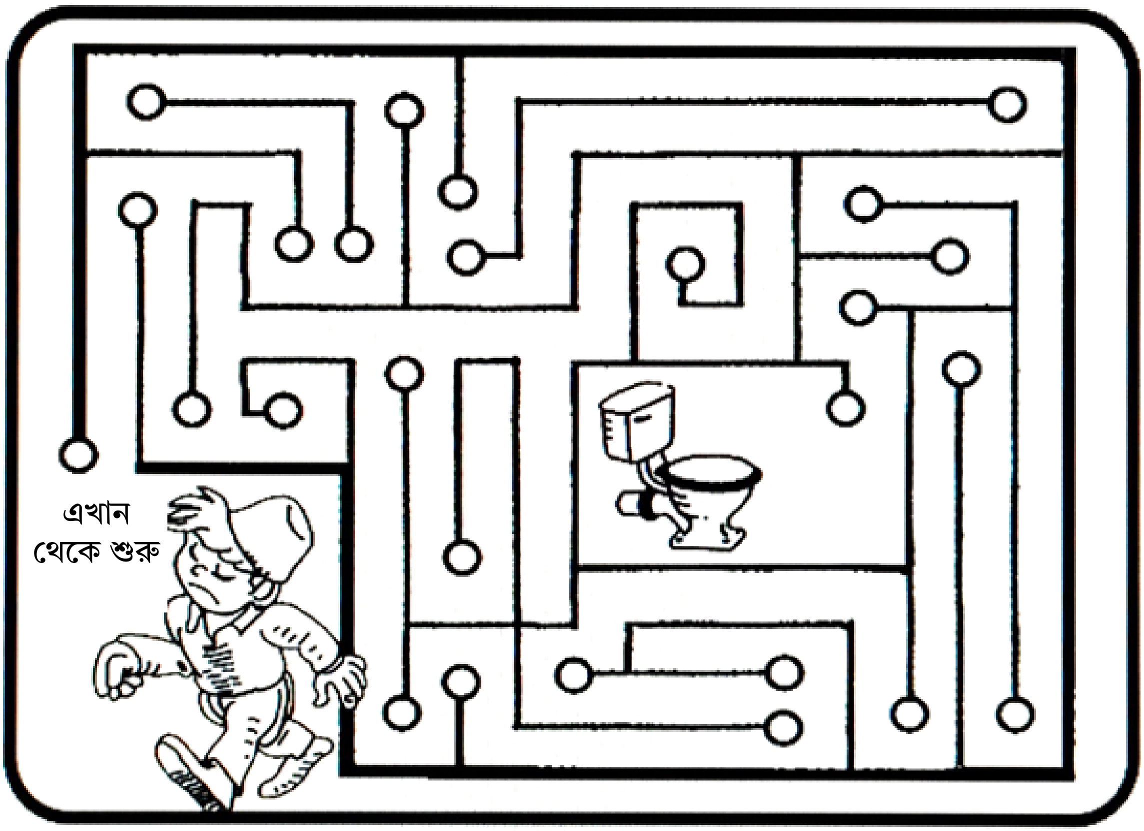

অজু ও পাক-পবিত্রতা সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়াবলি

ফরজ সালাত সম্পাদন করতে অবশ্যই মুসলিম ব্যক্তিকে পাক-পবিত্র হতে হবে। তাকে নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন মুখ, হাত এবং পা ধৌত করতে হবে এবং মাথা মাসেহ করতে হবে। এ কাজগুলো করাকেই বলা হয় অযু।

আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়ানোর আগে অবশ্যই সকল দিক থেকে পবিত্র ও পাক সাফ হওয়া জরুরি। কেউ কি কোন রাষ্ট্র প্রধানের কাছে অপরিষ্কার চেহারা নিয়ে হাজির হয়? কেউ কি কখনো হাত না ধুয়ে খাইতে শুরু করে? কেউ কি কখনো ঘর্মাক্ত শরীর এবং নোংরা চুল নিয়ে স্কুলে যায়? আমরা যেভাবে অন্যের সম্মুখে যেতে নিজেকে প্রস্তুত করি, পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করি, তেমনি আল্লাহর পাকের সামনে দাঁড়ানোর আগে প্রস্তুতি গ্রহণ আবশ্যক। অজু হলো সে প্রস্তুতি।

অজুর প্রাথমিক উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হচ্ছে অন্তরাত্মাকে আলোকিত করা, অন্তরে প্রশান্তি লাভ ও মন্দ চিন্তা থেকে হৃদয়কে পবিত্র করা। সর্বোপরি দুশ্চিন্তা ও হতাশা থেকে মনকে মুক্ত করা।

অজু একজন ব্যক্তিকে সজীবতা দান করে এবং ইবাদতের জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রস্তুত করে। ইহা দুনিয়াবি দুশ্চিন্তা ও অন্য পেশার চিন্তা মন থেকে সরিয়ে দেয়। প্রার্থনার জন্য মন এবং দেহে ভক্তি জাগায় ও আগ্রহী করে।

নামাজের পূর্বে সহজে ও সানন্দে অজু করার নিমিত্তে মসজিদে অজুখানা রাখা হয়। অবশ্য ঘর থেকে অজু করে আসা উত্তম। অজুখানা অবশ্যই পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং পানি হবে অবশ্যই পরিষ্কার।

অজু করতে সর্বোচ্চ এক মিনিট বা তার কিছু বেশি সময় লাগতে পারে। নবী মুহাম্মদ সা. অজুতে পানির অপচয় না করতে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

অজুকারী ব্যক্তির শরীর থেকে কিছু বের না হলে এবং ব্যক্তি ঘুমিয়ে না পড়লে তার অজু বহাল থাকে। এক ব্যক্তি তার একবারের অজু দিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছা ইবাদত বন্দেগী করতে পারে। তবে প্রতিবারের সালাতের জন্য নতুন করে অজু করতে নবী মুহাম্মদ সা. আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন।

অবশ্য সেই ব্যক্তির জন্য নামাজ পড়তে শুধু অজুই যথেষ্ট হবে না, যে তার স্বামী কিংবা স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ পরিবেশে সময় কাটিয়েছে ও পরস্পরকে উপভোগ করেছে অথবা যে মহিলা তার মাসিক ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হয়েছে অথবা স্বপ্নে কিছু দেখে যার যৌনাঙ্গ থেকে কিছু বের হয়েছে, তার ক্ষেত্রে অজুর পূর্বে অবশ্যই গোসল করে নিতে হবে।

রাসূলে কারীম সা। একবার বলেছেন, *"জান্নাতের চাবি হলো সালাত আর সালাতের চাবি হলো পাক পবিত্রতা।"*

সালাতের পূর্বে নির্দিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করার এ বিধানটি ইসলামে নতুন নয়। পূর্ববর্তী নবীগণও তাদের উম্মতকে ইবাদতের পূর্বে এভাবে নির্দিষ্ট অঙ্গ প্রতঙ্গ ধৌত করার বিধান শিক্ষা দিতেন।

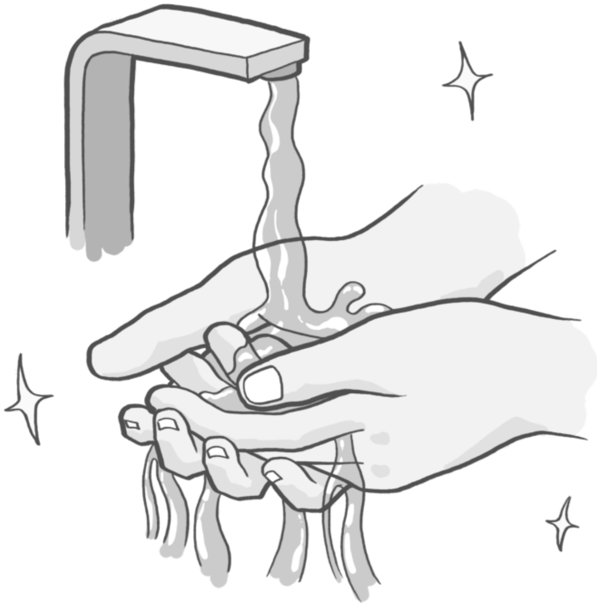

পাঠ ৩

অজু

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে পারবে,

- *পবিত্রতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হল অজু ও তা করতে হবে সঠিক পদ্ধতিতে*
- *দ্বীন ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা মানুষকে কুসংস্কারে নিপতিত করে ও নোংরা বানায়*
- *সঠিকভাবে অজু না করলে ইসলামের দৃষ্টিতে পাক-পবিত্র হওয়া যায় না*
- *ইসলামের জরুরী বিষয় শিক্ষা দিতে গিয়ে কাউকে অসস্তিতে ফেলা ঠিক নয়*
- *ভালো কিছু শিক্ষা দেওয়ার উত্তম পদ্ধতি হলো নিজে বাস্তবে করে দেখানো*
- *যে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় এমনকি সে বয়সে ছোট হলেও*

অজু

সালাত বা কোরআন তেলাওয়াতের পূর্বে অজু করতে হয়। অজু ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অজু ছাড়া সালাত শুদ্ধ হয় না। ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করাকে অজু বলা হয়। সঠিক ও সুন্দরভাবে অজু করার জন্য আমরা ১২টি ধাপ অবলম্বন করতে পারি। ধাপগুলো নিম্নরূপ:

১. প্রথমেই এই নিয়ত করা যে, অজু করছি, আল্লাহর জন্য ইবাদতের উদ্দেশ্যেই।

২. অতঃপর "বিসমিল্লাহ" বলে শুরু করা

৩. দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়া। প্রথমে ডান হাত তারপর বাম হাত ধুয়া।

৪. তিনবার মুখে পানি দিয়ে গড়গড়া করা।

৫. নাকের ভিতর পানি দিয়ে তিনবার নাক পরিষ্কার করা।

৬. পূর্ণ চেহারা ভালোভাবে তিনবার ধৌত করা। চুলের গোড়া থেকে থুতনি পর্যন্ত এবং এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত পুরো মুখমন্ডল ধুয়া।

৭. উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা। প্রথমে ডান হাত ধৌত করা।

৮. মাথা মাসেহ করা। ভিজা হাত মাথার উপর দিয়ে সামান থেকে পিছনে নেয়া এবং পিছন থেকে সামনে নিয়ে আসা।

৯. কান মাসেহ করা। ভিতর এবং বাহির একবার। প্রয়োজনে ঘাড় মাসেহ করা যেতে পারে।

১০. দুই পা টাকনু সহ তিনবার ধুয়া। ডান পা দিয়ে শুরু করা।

১১. অতঃপর নিম্নলিখিত কালেমা শাহাদাত পাঠ করা

اشْهَدُ انْ لّآ اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً اعَبْدُهوَرَسُوْلُه

(**উচ্চারণ:** আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারিকালাহু ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু)

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত না এবং আল্লাহর কোন অংশীদার নেই | আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সা. আল্লার বান্দা এবং রাসূল |

১২. তারপর নিচের দোয়াটি পড়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

(**উচ্চারণ:** আল্লাহুম্মাজ আলনী মিনাত তাওয়াবীনা, অজ্আলনী মিনাল মুতাত্বাহ্হিরীন)

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

উল্লেখ্য, অজুখানা এবং টয়লেট একই কক্ষের ভিতরে হলে কক্ষ থেকে বের হওয়ার পর শাহাদাত ও দুয়া পড়তে হবে।

অনুশীলনী ১৭

ক. নিচের চারটি অঙ্গ রং কর এবং ছোট ঘরে ১, ২, ৩ ও ৪ লিখে ধারাবাহিকতা বুঝিয়ে দাও।

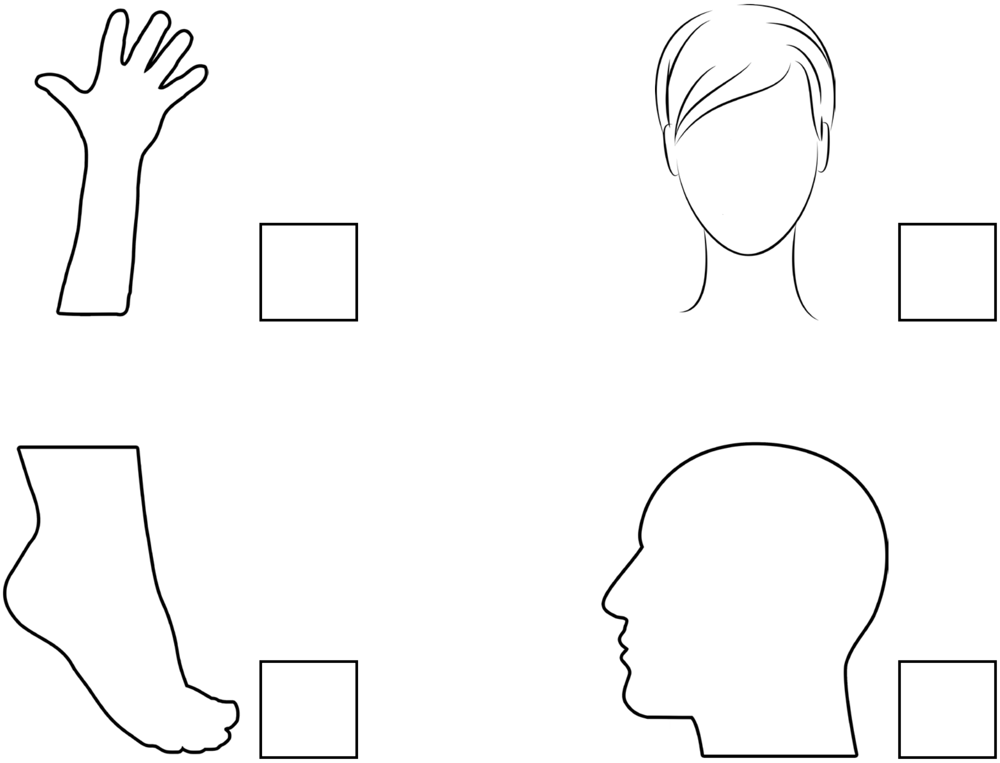

স্মরণ রাখ, অজুতে এ চারটি কাজ হলো ফরজ বা অবশ্য করণীয়। এ চারটির কোন একটি অঙ্গ অজুতে বাদ পড়লে অজু হবে না।

খ. সঠিক অংশটি বৃত্ত দ্বারা আবৃত্ত কর।

১. অজু অর্থ হলো **নির্দিষ্ট অঙ্গ সমূহ / পূর্ণ শরী**র ধৌত করা।

২. অজুর নিয়ত **মনে মনে করলে / মুখে উচ্চারণ** করতে হয়।

৩. দুই হাত **তিনবার / একবার** ধৌত করতে হবে।

৪. **কুলি করা / নাকে পানি** দেয়ার আগে **কুলি করতে / নাকে পানি** দিতে হবে।

৫. **আংশিক / পূর্ণ** মুখমণ্ডল ধৌত করতে হবে **তিন / এক** বার।

৬. দুই বাহু **কনুই / কাঁধ** পর্যন্ত ধৌত করতে হবে।

৭. ভিজা হাত দ্বারা মাথা **ধৌত / মাসেহ** করবে।

৮. পা ধুইতে হবে সবকিছুর **পরে / আগে**।

৯. পা ধৌত করতে হবে **টাকনু / হাঁটু** পর্যন্ত **এক / তিন** বার।

১০. হাত, বাহু ও পা ধৌত করা শুরু হবে **বাম / ডান** থেকে আগে।

ইতিহাসের গল্প

হাসান ও হোসেন এবং উত্তম অজু শিক্ষাদান

হাসান ও হোসেনের নাম কে না জানে? তারা ছিলেন প্রিয় নবী মুহাম্মদ সা. এর আদরের দুই নাতি। ছোটকাল থেকেই তারা ছিলেন খুবই মেধাবী ও বুদ্ধিমান। তারা তাদের পিতা হযরত আলী রা. ও মাতা হযরত ফাতেমা রা. কাছ থেকে ইসলাম শিখেছিলেন। নবীজির কাছ থেকে সরাসরি ইসলামের তালিম ও পেয়েছিলেন তারা। ফলে কম বয়সে ইসলামের অনেক বিষয়ই তারা বড়দের চেয়েও ভালো জানতেন। তবে বড়দের সাথে তারা সম্মান রক্ষা করে চলতেন।

একদা মরু এলাকার গ্রামীণ এক বৃদ্ধ ব্যক্তি মদিনায় এলেন। তিনি ইসলামে খুব নতুন ছিলেন। ইসলাম সম্পর্কে তেমন জানতেন না। নামাজের সময় হলে তিনি অজু করতে গেলেন। তিনি সঠিকভাবে অজু করতেও জানতেন না। অজুতে তিনি অনেক উল্টাপাল্টা করে ফেললেন। ঘটনাটি হাসান এবং হোসাইন কাছে থেকে দেখছিলেন। তারা জানতেন যে, অজু ঠিক সেভাবে করতে হবে যেভাবে নবী মুহাম্মদ সা. শিক্ষা দিয়েছেন। আর অজু সঠিক না হলে যে নামাজও সঠিক হয় না, তাও তারা ভালো করেই জানতেন।

হাসান তার ছোট ভাই হোসেন কে বললেন, "*ঐ বৃদ্ধ লোকটিকে আমাদের অজু শিখিয়ে দেওয়া উচিত।*" হোসেন বললেন, "*তা তো বুঝলাম, কিন্তু তা কিভাবে করব? আমরা যদি তাকে বলি যে, তার অজু সঠিক হয়নি, তখন তো তিনি লজ্জায় পড়ে যাবেন।*" হাসান বললেন, "*কথা তো সঠিক, আমরা দুইজন ছোট বালক আর তিনি হচ্ছেন একজন বয়স্ক ব্যক্তি।*"

এ অবস্থায় তারা কি করেছিলেন? তারা এই বয়স্ক লোককে লজ্জা না দিয়ে কিভাবে সংশোধন করেছিলেন? আচ্ছা, তুমি তখন কি করতে, যদি তুমি হাসান

ও হোসেনের স্থানে থাকতে?

তারা দুজনে মিলে একটি বুদ্ধি করলেন। একটি জগে পানি ভর্তি করে তারা দুজন বৃদ্ধ লোকটির কাছে গেলেন। বললেন, "*আসসালামু আলাইকুম*"। তিনি হাসিমুখে জবাব দিলেন, "*ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, নবীজির প্রিয় নাতিগণ*"। তার হাসিতে বুঝা যাচ্ছিল তিনি তাদেরকে খুব ভালোবাসেন। সকল মুসলিমই তাদের ভালবাসতেন, কারণ তারা যে ছিলেন নবীজির ভালোবাসার পাত্র।

তারা বললেন, "*চাচা আমাদের দুইজনের মধ্যে কার অজু উত্তম হয়, আপনি কি তা নির্বাচন করতে পারবেন?* বৃদ্ধ লোকটি বললেন, "*অবশ্যই। এটা তো আমার জন্য সম্মানের বিষয়।*" অতঃপর তাদের দুজনই পৃথক পৃথকভাবে সুন্দর করে অজু করলেন যেভাবে তারা নবীজির কাছ থেকে অজু করতে শিখেছিলেন।

লোকটি তাদের নিখুঁত অজু করার দৃশ্য মন ভরে দেখলেন। আর নিজের অজুতে যে ভুল হয়েছে তা তিনি বুঝতে পারলেন। তিনি শিখে নিলেন কিভাবে সুন্নাহ অনুযায়ী অজু করতে হয়। তাদের অজু শেষ হলে তিনি বললেন, "*আমি একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, তোমরা উভয়ই বিজয়ী হয়েছ।*" তিনি উভয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "*দুজনেই সমানভাবে উত্তম রূপে অজু করেছ।*"

এই গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্ন লিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক ও অভিভাবক শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন

- সব শিক্ষকের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন নবী মুহাম্মদ সা.ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
- আর সবচেয়ে উত্তম ছাত্র ছিলেন নবীজির সাহাবীগণ।
- উত্তম শিক্ষকের কাছেই উত্তম ছাত্র তৈরি হয়। এজন্য ভালো কিছু শিখতে হলে উত্তম এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের কাছে যেতে হবে, বিশেষ করে ইসলামের ব্যাপারে।
- ইসলামের ব্যাপারে অজ্ঞতা মানুষকে মন্দের দিকে পরিচালিত করে।
- অজু সেভাবেই করতে হবে যেভাবে নবী মুহাম্মদ সা.ল্লাল্লাহু সাল্লাম করেছেন।
- অজু সঠিক না হলে নামাজ ও সঠিক হবে না আর ছোয়াব ও পাওয়া যাবে না।
- কোন লোক ভুল করলে তাকে সংশোধন করা উচিত।
- কোন কোন সময় শিশুরা বড়দের চেয়ে অধিক জানতে পারে।
- শিশুরা বড়দের শিক্ষা দিতে পারে এবং বড়রা শিশুদের কাছ থেকে শিখতে লজ্জা বোধ করবে না।
- কাউকে এমন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয় যাতে সে লজ্জাবোধ করে।
- লোকদেরকে কিছু শিক্ষা দেওয়ার সর্বোত্তম পন্থা হলো নিজে করে দেখানো।
- শিশুরা অবশ্যই বড়দের সম্মান করবে, কখনো উচিত নয় বড়দেরকে এমন অবস্থায় ফেলা যে তারা লজ্জাবোধ করেন।
- ছোটরা বড়দের আগে সালাম করবে আর বড়রা উত্তমরূপে সালামের জবাব দেবে।
- নবীজির নাতিদের প্রতি ভালোবাসা নবীজির প্রতি ভালোবাসার অংশ।
- মুসলিম ব্যক্তি উত্তম ও ধর্মীয় কাজে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করবে, দুনিয়াবী কাজে নয় এবং বড়ত্ব প্রকাশের জন্য নয়।
- যে কোন কাজ না জানলে তা অন্য লোকের কাছ থেকে শিখতে প্রস্তুত হওয়া উচিত, যদিও সে বয়সে ছোট হয়।

অনুশীলনী ১৮

ক. নিচের প্রতিটি লাইনে চারটি করে শব্দ আছে। তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত আর একটি সম্পর্কহীন। সম্পর্কহীন শব্দটি বৃত্ত দিয়ে চিহ্নিত কর।

অজু	ইবাদত	ধৌতকরা	কাফির
ইস্তেঞ্জা	নিয়ত	মনে মনে	অজু
দুইহাত	তিনবার	মসজিদ	ধৌতকরা
মুখমন্ডল	কুলি	তিনবার	পানি
পূর্ণ	মুখমন্ডল	ধৌত	একবার
দুইবাহু	কনুই	ডান	মাছেহ
মাথা	বাম	একবার	মাছেহ
তিনবার	দুইকান	ভিতর	বাহির
দুইপা	টাখনুপর্যন্ত	ধৌত	হাটুপর্যন্ত

খ. অজুর শেষে কী পড়তে হয় অর্থসহ মুখস্ত বল।

নোট: *শিক্ষক নিশ্চিত করবেন, শিক্ষার্থীরা যেন অজুর শেষের দুয়া বিশুদ্ধভাবে বলতে পারে।*

সালাত ও ঈমান

সুস্থ থাকার জন্য যেভাবে আমাদের শরীরের যত্ন নিতে হয়, তেমনি যত্ন নিতে হয় আমাদের ঈমানেরও। '*আমি ঈমান এনেছি*' একথা বললেই ঈমানের কাজ শেষ হয়ে যায় না। ঈমানকে সুস্থ সবল এবং কার্যকর রাখতে হলে, সদা সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ রাখতে হবে ,আল্লাহকে ভুলে গেলে চলবে না।

আল্লাহকে স্মরণে রাখার জন্য ইসলাম এজন্য আমাদের উপর কিছু রুটিন কাজ নির্ধারন করে দিয়েছে, যা প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্যই পালন করতে হবে। আল্লাহ নির্ধারিত এ ধরনের ফরজ কাজকে কেউ যদি অবহেলা করে কিংবা এক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রদর্শন করে, তবে নিঃসন্দেহে তার ঈমান দুর্বল হয়ে যাবে এবং ধীরে ধীরে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে।

মুমিন ব্যক্তির প্রাত্যহিক রুটিন কাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তার প্রাত্যহিক সালাত। সালাত শব্দকে বাংলা এক বা একাধিক শব্দে বুঝানো সম্ভব নয়। আমরা যদি একে প্রার্থনা বলি তাহলে তা সঠিক হবে না। কারণ প্রার্থনার আরবি হলো দুয়া।

সালাত আদায়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি এবং কিছু পূর্ব প্রস্তুতি রয়েছে, যা নবী মুহাম্মদ সা. তার উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। এই শিক্ষাগুলোতে কোন ধরনের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সালাতকে বিনষ্ট করে দেয়।

সালাত নির্ধারিত সময় আদায় করতে হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সালাত আদায় না করলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। ইচ্ছাকৃত সালাত আদায় না করা বা সালাতের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন একজন ব্যক্তিকে ইসলামের বাহিরে নিয়ে যায়।

বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে ঐক্য নির্ধারণের স্বার্থে সালাতকে নির্দিষ্ট একটি ভৌগোলিক স্থানের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, আর তা হল মক্কায় অবস্থিত কাবা। তাই ইসলামে সালাত প্রকৃতি, স্থান ও কালের আবর্তনের সাথে সম্পর্কিত । সালাত একজন মানুষের জীবন আচরণের উপর স্বাভাবিক প্রভাব বিস্তার করে।

সালাত আমাদের দেহের সব ধরনের নড়াচড়া কে অন্তর্ভুক্ত করে। আমাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ মুখী করে দেয়। সালাত প্রতিদিন আমাদেরকে পাঁচ পার আল্লাহর কথা সচেতন ভাবে মনে করিয়ে দেয়। সালাতে কোরআন তেলাওয়াতকে আবশ্যিক করা হয়েছে। যখনই আমরা কোরআন তেলাওয়াত করি তখন কোরআনের প্রতিটি আয়াত আমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মোটকথা সালাত আমাদেরকে প্রতিনিয়ত আল্লাহর বান্দা হিসেবে দুনিয়াতে জীবন যাপন করতে প্রেরণা যোগায়। যে সকল কাজ আল্লাহ নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকার জন্য সালাত হচ্ছে আমাদের প্রাত্যহিক প্রশিক্ষণ।

পাঠ ৪

সালাত

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে পারবে,

- *ইসলামের দৃষ্টিতে সালাত কি, কখন ও কিভাবে করতে হয়*
- *আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম উপায় হল সালাত*
- *সালাত মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে*
- *একজন মুসলিমের কাছে নামাজের চাইতে তৃপ্তিরকর আর অন্য কিছু নেই*
- *মনোযোগ সহকারে সালাত আদায় না করলে সালাতের উপকার পাওয়া যায় না*
- *সালাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহকে স্মরণ করা*
- *দুনিয়ার ব্যস্ততা ও আকর্ষণ সালাতের প্রতি মুমিনের আগ্রহ নষ্ট করে দেয়*
- *একজন প্রকৃত মুসলমান কখনও আল্লাহ এবং তার মধ্যখানে অন্য কোন কিছুকে বাধা হতে সুযোগ দেয়না*

সালাত

সালাত কী: সালাত আরবি শব্দ যার বাংলা হল প্রার্থনা। তবে যে কোনো ধরনের প্রার্থনা কে সালাত বলা যায় না। ইসলামে বিশেষ ধরনের একটি ইবাদত হলো সালাত। সালাতের মধ্যে রয়েছে দাঁড়ানো, রুকু করা, সেজদা দেয়া, কোরআন পাঠ করা ইত্যাদি বহুবিদ কাজ। সালাত কে আমরা বাংলায় নামাজ বলে থাকি। সালাত ফরজ ইবাদত।

সালাতের সময়:আল্লাহ তার বান্দাদের উপর দৈনিক পাঁচবার সালাত আদায় করা ফরজ করেছেন। আর সেগুলো হল:

১. ফজর: ভোর রাতের নামাজ

২. যোহর: দুপুর বেলার নামাজ

৩. আসর: বিকালের নামাজ

৪. মাগরিব: সন্ধ্যাকালীন নামাজ

৫. ইশা: রাতের নামাজ

সালাতের রাকাত: সালাতে দাঁড়ানো থেকে নিয়ে সেজদা সমাপ্ত করাকে আরবিতে রাকাত বলা হয়। সালাত দুই, তিন ও চার রাকাত বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

সালাতের মধ্যে আবার কিছু সালাত ফরজ (অবশ্য করণীয়), কিছু ওয়াজিব (অবশ্য পালনীয়) ও কিছু সুন্নাত (যা করা উচিত)।

সুন্নাত আবার দুই প্রকার: সুন্নাত মুয়াক্কাদা (যা নবীজি প্রায় সর্বদাই করতেন) ও সুন্নাত মুস্তাহাব্বা (যা কখনো করতেন আবার কখনো ছেড়ে দিতেন)।

নিচে ৫ ওয়াক্ত সালাতের রাকাত সংখ্যা বিস্তারিত দেখানো হলো:

সালাত	সুন্নাত		ফরজ	সুন্নাত		ওয়াজিব	নফল	মোট
	মুআক্কাদাহ	মুস্তাহাব্বাহ		মুআক্কাদাহ	মুস্তাহাব্বাহ	(ভিতর)		
ফজর	২		২					৪
জোহর	৪		৪	২	২			১২
আসর		৪	৪					৮
মাগরিব			৩	২	২			৭
ইশা		৪	৪	২	২	৩	২	১৭
মোট								৪৮

সালাতের ক্ষেত্রে করণীয়: সালাতের সময় হলে ঈমানদার ব্যক্তিকে সকল কাজ ও খেলাধুলা বন্ধ করে দিতে হবে। তখন নিরব হয়ে নামাজের প্রস্তুতি নিতে হবে। সালাত আদায়কালে আমরা অনুভব করব, আমরা আল্লাহ পাকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি এবং তিনি আমাদেরকে দেখছেন। একজন মুমিন সালাতের মাধ্যমে মূলত আল্লাহর সাথে কথা বলে। সালাত হচ্ছে আল্লার ইবাদতের সর্বোত্তম মাধ্যম। সালাত আল্লাহর প্রতি ধন্যবাদ জানানোর অন্যতম উপায়। সালাত আমাদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করে ও ভালো কাজ করতে উৎসাহ যোগায়। সালাত আমাদেরকে আল্লাহর খুব কাছাকাছি নিয়ে যায়। জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হল সালাত।

মুসলমানরা জামাতের সাথে মসজিদের নামাজ আদায় করার জন্য নির্দেশিত হয়েছে। তবে কোথাও যদি কোন মসজিদ পাওয়া না যায়, তবে মুসলিম ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজন নিয়ে ঘরে সালাত আদায় করতে পারবে। মহিলাদের মসজিদে যাওয়া জরুরি নয়। তবে তারা মসজিদের গিয়ে সালাত পড়তে পারবে যদি মসজিদে বিশেষ সুবিধা থাকে। নামাজ হচ্ছে মুমিন এবং কাফির ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী একটি বিষয়।

সালাতের পদ্ধতি: সালাত আদায়ের জন্য সালাতের পদ্ধতি জানা খুবই জরুরি। ২ রাকাত বিশিষ্ট একটি মৌলিক সালাতে ১৫ টি বিশেষ অবস্থান রয়েছে। এগুলো আমাদের প্রত্যেককেই জেনে নিতে হবে। নিম্নে সেই অবস্থানগুলো বর্ণনা করছি:

১. তাকবীর তাহরিমা (সালাত শুরুর তাকবীর)

২. কিয়াম (দাঁড়ানো)

৩. রুকু (রুকু করা)

৪. কাওমাহ (সংক্ষিপ্ত দাঁড়ানো)

৫. সাজদা উলা (প্রথম সেজদা)

৬. জলসা (সংক্ষিপ্ত বসা)

৭. সাজদা সানিয়া (দ্বিতীয় সেজদা)

(২ থেকে নিয়ে ৭ নম্বর পর্যন্ত পুনরায় করতে হবে দ্বিতীয় রাকাতে)

১৪. কায়দা আখেরা (শেষ বৈঠক)

১৫. সালাম (প্রথমে ডানে ও পরে বামে সালাম ফিরানো)

নোট: *নামাজের ভিতরে কখন কি পড়তে হয় তা শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নিবে এবং পরবর্তী শ্রেণীতে (**শিশু মনে দ্বীনের আলো ৩** বই হতে) এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবে।*

অনুশীলনী ১৯

ক. নিচের ঘরে রক্ষিত উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

নামাজ ফরজ পদ্ধতি সালাত দেখছেন কাফির
খেলাধুলা ধন্যবাদ জান্নাতে পাপ

১. ইসলামে বিশেষ ধরনের একটি ইবাদত হলো ------------------।

২. সালাত কে আমরা বাংলায় --------- বলে থাকি।

৩. আল্লাহ দৈনিক পাঁচবার সালাত আদায় করা ---------- করেছেন।

৪. সালাতের সময় হলে সকল কাজ ও --------- বন্ধ করে দিতে হবে।

৫. সালাতে আমরা অনুভব করব, আল্লাহ আমাদের -------।

৬. সালাত আল্লাহর প্রতি --------- জানানোর অন্যতম উপায়।

৭. সালাত আমাদেরকে ------- থেকে মুক্ত করে।

৮. ---------যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হল সালাত।

৯. সালাত হচ্ছে মুমিন এবং --------- ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী।

১০. সালাত আদায়ের জন্য সালাতের ---------জানা খুবই জরুরি।

খ. বাম পাশের নামের সাথে ডান পাশের বিবরণ মিলাও

নাম	***বিবরণ***
আসর	ভোর রাতের নামাজ
যোহর	বিকালের নামাজ
ইশা	সন্ধ্যাকালীন নামাজ
ফজর	রাতের নামাজ
মাগরিব	দুপুর বেলার নামাজ

গ. বাম পাশের ছবির সাথে ডান পাশের শব্দ মিলাও

	সাজদা
	রুকু
	তাকবীর তাহরিমা
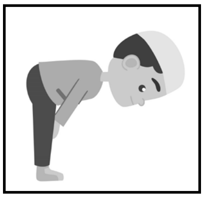	কিয়াম
	সালাম
	জলসা

হাদিসের গল্প
সালাতে মনযোগ

একজন ঈমানদার ব্যক্তি সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। সে সালাত যত আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ হবে বান্দা আল্লাহকে ততই কাছে অনুভব করতে পারবে। সালাতে বান্দা আল্লাহর সাথে কথপোকথন করে। আর আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বললে কতটা ভয় ও মনোযোগী হওয়ার দরকার নিশ্চয় তা বুঝতে পেরেছো?

মানুষ সাধারণত দুনিয়ার রাজা বাদশার সামনে কথা বললে জড়োসড়ো হয়। তাহলে যিনি সকল বাদশাহের বাদশা মহা ক্ষমতাধর বিশ্ব অধিপতি তার সামনে দাঁড়ালে কেমন বিনীত হতে হবে? মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়ালে আমাদের অবস্থা কেমন হওয়া চাই!

সাহাবীগণ নবী মুহাম্মদ সা. আর কাছ থেকে সালাতের তালিম গ্রহণ করেছিলেন। সালাতে তাদের মনযোগ ও খুশু-খুজু ছিল অতুলনীয়। সালাতে সামান্য অমনযোগিতাকে তারা অনেক বড় সমস্যা মনে করতেন।

হজরত আবু তালহা আনসারী রা. ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহাবি। তিনি একবার তার এক বাগানে নামাজ আদায় করছিলেন। তখন একটি ছোট পাখি উড়তে শুরু করল। বাগান এত ঘন ছিল যে এই ক্ষুদ্র পাখিটি পথ খোঁজে পাচ্ছিল না। তাই পাখিটি এদিক-সেদিক বের হওয়ার পথ খোঁজতে শুরু করল। এই দৃশ্য তার খুব ভালো লাগল। সেই সাথে পাখিটি মিষ্টি স্বরে চিপ চিপ টুন্ টুন্ করছিল। পাখিটির মিষ্টি কণ্ঠের গানের আবহ আবু তালেহার মনে দুলা দিতে লাগলো। ফলে তার মনোযোগ কিছুটা সেদিকে চলে গেল। হঠাৎ তার মনে এলো তিনি তো আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছেন। তাই তিনি মনকে

সালাতে নিয়ে আসতে চেষ্টা করলেন। তিনি পুনরায় সালাতের দিকে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু অবস্থা এই দাঁড়াল যে, তিনি স্মরণ করতে পারছিলেন না, নামাজ কত রাকাত আদায় করেছেন। বাগানের এই সম্পদ যেন তাকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে!

তিনি সালাত শেষ করে ভাবতে লাগলেন, কেন তার সালাতে এমনটি হয়েছিল। তাহলে কি তার বাগান ও সুন্দর পাখির মিষ্টি গান তার সালাতের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল? তিনি বিলম্ব না করে নবী মুহাম্মদ সা. এর কাছে চলে গেলেন। কিভাবে তার বাগান ও পাখি তার সালাতে বিঘ্ন ঘটালো তা খুলে বললেন। তারপর বললেন, *"হে আল্লাহর রাসুল সা.! যে সম্পদ আমার নামাজের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে তা আমি আল্লাহর জন্য দান করে দিচ্ছি। আপনি যেখানে পছন্দ করেন তা সেখানে ব্যয় করুন।"*[৬]

৬. মুয়াত্তা ইমাম মালিক : ২১৪

এই গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্ন লিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক ও অভিভাবক শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন

- একজন ঈমানদার ব্যক্তির কাছে নামাজের চাইতে আর গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় নেই
- নামাজের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন
- যে নামাজে মনোযোগ নেই সে নামাজ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না
- যে নামাজে মনোযোগ নেই সে নামাজ দিয়ে আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়া যায় না
- দুনিয়ার যে বস্তু আমাদের সালাতে মনোযোগ বিনষ্ট করে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত
- নামাজে মনোযোগ বৃদ্ধির জন্য আমরা আল্লাহর রাস্তায় সদকা করতে পারি
- নামাজ আত্মার প্রশান্তির একটি অন্যতম মাধ্যম
- যে নামাজে আত্মার প্রশান্তি অর্জিত হয় না সে নামাজকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে
- সাহাবীগণ তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নবীজির সাথে পরামর্শ করতেন
- দ্বীনি কোন বিষয়ে খটকা তৈরী হলে তার সমাধান আলেমদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে

অনুশীলনী ২০

ক. শব্দ ধাঁধা হতে নিচের শব্দগুলো খোঁজে বের কর ও বৃত্ত দ্বারা চিহ্নিত করো।

আন্তরিক	মনোযোগ	দাঁড়ালেন	আনসারী	পাখি	পরীক্ষা	সালাত

প	রী	খি	সা	লা	গ	ক	ন	পা
রী	প	আ	যো	ক	ম	দাঁ	ন্ত	খি
ক্ষা	ক্ষা	ন্ত	গ	সা	নো	লে	আ	লা
ন্ত	ড়া	রি	লা	সা	লা	ন্ত	ন	ম
ন	পা	ক	ম	ক	আ	ত	সা	দাঁ
ড়া	ম	নো	যো	গ	সা	ক	রী	আ
রি	ন	দাঁ	ড়া	লে	ন	ত	ক	সা
পা	ড়া	ন	রী	ক্ষা	ক্ষা	ন	ত	রী

আদ'ইয়্যাত ও আদাব
(দুয়া দুরুদ ও শিষ্টাচার)

আদ'ইয়্যাত

আদ'ইয়্যাত শব্দটি আরবি। একবচনে দুয়া। দুয়া অর্থ হল প্রার্থনা। আল্লাহর এক নগণ্য দাস তার সৃষ্টিকর্তার কাছে তার নিজ প্রয়োজন কিংবা দাসত্ব প্রকাশ করাকেই দুয়া বলে। সৃষ্টিকর্তার কাছে এ জাতীয় আবেদন বা অনুনয় বিনয় এক প্রকার ইবাদাত। আল্লাহ হচ্ছেন চিরন্তন সত্তা। তিনি সব কিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন এবং সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন। তার ইচ্ছা বাস্তবায়নে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। একমাত্র তিনিই বান্দার সকল প্রয়োজন বিনা বাধায় পূরণ করতে পারেন। আল্লাহর প্রতি এই বিশ্বাস বান্দাকে তার মুখাপেক্ষী হতে উৎসাহিত করে, তার কাছে সব সমস্যা খুলে বলতে প্রেরণা যোগায়। বান্দা তার ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য তার কাছেই ফিরে যায়।

দুয়ার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি কিংবা কোন নির্দিষ্ট ভাষার প্রয়োজন নেই। বান্দা যে কোন সময়, যে কোন উপায়ে, যে কোনো ভাষায় তার স্রষ্টার কাছে তার মনের আকুতি পেশ করতে পারে। কোন প্রার্থনা যদি বান্দার মনের গহীনে উদয় হয়, সেটাও আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। কোন বিলম্ব ছাড়াই আল্লাহ তার বান্দার প্রার্থনা শুনতে এবং তার জবাব দিতে পারেন। আল্লাহর কাছে চাওয়ার কোন শেষ নেই। যত বেশিই চান, তিনি কখনো বিরক্ত হবেন না। যে আল্লার কাছে যত বেশি প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে ততই বেশি পছন্দ করেন, সে আল্লাহর ততো ঘনিষ্ঠ বান্দায় পরিণত হয়। প্রকৃত বান্দার উচিত সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর কাছে দুয়া এবং প্রার্থনা অব্যাহত রাখা। দুয়ার গুরুত্বের ব্যাপারে কোরআনের এই বর্ণনাই যথেষ্ট:

"*হে মুহাম্মদ! লোকদের বল, আমার রবের তোমাদের কি প্রয়োজন, যদি তোমরা তাকে না ডাকো।*" (সূরা ফুরকান: ৭৭)

দুয়া মুমিন ব্যক্তির অন্যতম একটি গুণাবলি যা তাকে একজন কাফির থেকে পৃথক করে। দুয়া একজন ব্যক্তির আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের প্রমাণ।

অনেক লোক বিশ্বাস করে গোটা বিশ্ব জাহান তার আপন গতিতেই চলছে। তার উপর কারো কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু তারা এটা জানেনা যে, এই বিশ্ব জাহানের সকল সৃষ্টি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় একজন সৃষ্টিকর্তার কাছে আত্মসমর্পণ করে আছে। সকল সৃষ্টির ভাগ্য আল্লাহ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। ইমানদার ব্যক্তি এটা বিশ্বাস করে যে যিনি তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন, কেবল তার কাছে প্রার্থনার মাধ্যমেই তার প্রাপ্য সে নিয়ে আসতে পারে। তারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ হচ্ছেন সব কিছুর স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রক।

তবে এটাও জেনে রাখা উচিত যে, যা কিছু আল্লাহর কাছে চাওয়া হবে সবকিছুই তাৎক্ষণিক পাওয়া যাবেনা। আমরা আল্লাহর কাছে যা কিছু চাই তা আমাদের জন্য কল্যাণকর না কি অকল্যাণকর তা অনেক সময় আমরা জানি না। কি কল্যাণকর এবং কি কল্যাণকর নয় তা আমাদের চেয়ে আল্লাহই ভালো জানেন। আমাদের কিছু চাওয়া তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ না করে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলা তার বদলা অন্যভাবে দিয়ে দেন।

দুয়া হবে বিনয় ও নম্রতার সাথে একান্ত পরিবেশে। আর দুয়া আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে সে আশাও থাকতে হবে। আল্লাহর কাছে দুয়া করে আমরা বুঝাচ্ছি যে, আল্লাহ আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষমতা রাখেন। আমরা চাইলেও সব কাজ নির্ভুলভাবে করতে পারি না। কেবল তখনই পারি যখন আল্লাহ চান। আল্লাহর কাছে দুয়া না করা এক প্রকার গর্ব বা অহংকার। আমার কাজ আমি করতে পারি, কার কাছে আমি চাইবো? এ মনোবৃত্তিকে আল্লাহ খুবই অপছন্দ করেন। দুয়া হচ্ছে বান্দার শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্যতম একটি সোপান। দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও মুক্তি লাভের আল্লাহ প্রদত্ত অন্যতম উপায়।

আদাব

নবী মুহাম্মদ সা.ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, "উন্নত চরিত্র ও শিষ্টাচারের সর্বোত্তম আদর্শ উপস্থাপন করতেই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।" তার আগমনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল, একজন মানুষকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী সর্বোত্তম চরিত্রের ও শিষ্টাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা। মানুষ সৃষ্টিগতভাবে যে সমস্ত গুণাবলি নিয়ে জন্মায় সেগুলোর উন্নতি ও বিকাশ সাধনই তার জীবনের অন্যতম করণীয়। অপরপক্ষে

সৃষ্টিগতভাবে প্রাপ্ত দুর্বলতা ও অসৎ গুণাবলির বিলোপ সাধন করা তার কর্তব্য। খারাপ গুণাবলি ও অভ্যাস মানব হৃদয়ের জন্য মরিচার মত। এ মরিচা দূরকরনের অন্যতম উপায় হল সৎ গুণাবলির বিকাশ সাধন ও অসৎ গুণাবলি কে যথাসাধ্য পরিমার্জন করে তার থেকে উপকার গ্রহণ করা। উত্তম গুণাবলির বিকাশে ও অসৎ গুণাবলির পরিমার্জিনে যে অপূর্ণতা থেকে যাবে তার জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমা চাওয়া ও তার কাছে তাওবা করাই একমাত্র উপায়।

সৎ গুণাবলির বিকাশ সাধনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাসূলুল্লাহ সা.ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ কথা স্মরণ রাখা যে, “উত্তম আমল হল তা যা নিয়মিত করা হয় যদিও তা খুবই তুচ্ছ এবং নগণ্য”। তাই প্রতিদিন কোন না কোনভাবে আমাদেরকে ভাল কাজ করতে হবে, আদাব ও শিষ্টাচারের প্রতিটি ছোটখাট বিষয় আয়ত্ত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কেবল এভাবেই আমরা পারি আমাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা উন্নত গুণাবলিকে বিকশিত করতে ও অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্বলতাকে প্রসংশনীয় পর্যায়ে উন্নীত করতে।

পাঠ ১-৮

শিখন উদ্দেশ্য (পাঠ ১ -৮): এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে পারবে,

- *দুয়া এবং অন্যান্য ইসলামিক অভিব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণের একটি অন্যতম উপায়*
- *মুমিন ব্যক্তির কোন একটি মুহূর্তও দুয়া ছাড়া অতিবাহিত হবে না*
- *আমরা যা চাই তা কেবল পেতে পারি তখনি যখন আল্লাহ আমাদের জন্য তা অনুমোদন করেন*
- *দুয়া আমাদের চিন্তা ও কর্মকে পরিশুদ্ধ করে এবং আমাদের জীবনে আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আসে*
- *দুয়া হল আমাদের দুর্বলতার স্বীকৃতি এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের একটি উত্তম উপায়*
- *দুয়ার পাশাপাশি ব্যক্তি তার নিজের মধ্যে লুকায়িত গুণাবলির বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হবে*
- *উত্তম গুণাবলি বিকাশের অন্যতম উপায় হল প্রতিদিন কিছু না কিছু ভালো কাজের অভ্যাস করা*

পাঠ ১

কালিমা তাইয়্যিবা ও কালিমা শাহাদাহ

কালিমা তাইয়্যেবা ও কালিমা শাহাদাহ মূলত মুসলিম ব্যক্তির মৌলিক বিশ্বাসের দুটি রূপ। অর্থের দিক থেকে দুটি প্রায় সমার্থক। এ দুটি কালিমা বহু সময় পড়তে হয়, যেমন কোন ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করতে হলে এই কালিমার ঘোষণা তাকে দিতে হবে। অজু করার শেষে কালেমা শাহাদাতের ঘোষণা দিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত ঈমানকে নবায়ন করে থাকি। এ দুটি কালিমা প্রত্যেক মুসলমান শিশুকে অবশ্যই মুখস্ত করে নিতে হবে এবং তার অর্থ ভালোভাবে বুঝতে হবে। অর্থগুলোও মুখস্থ করে নেয়া যেতে পারে।

কালিমা তাইয়্যেবা:

لَآ اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوُل اللّٰهِ

“আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল”

বাংলা	আরবি	বাংলা	আরবি
ইলাহ বা উপাস্য	اِلَهَ	নেই কোন	لَآ
আল্লাহর রাসূল	رَسُوُل اللّٰهِ	ছাড়া	اِلَّا

কালিমা শাহাদাহ:

اشْهَدُ انْ لّآ اِلهَ اِلّا اللّهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُه

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন শরিক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল”।

বাংলা	**আরবি**	**বাংলা**	**আরবি**
তার	لَه	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি	اشْهَد
বান্দা	عَبْدُ	যে	انْ
তার	ه	তিনি এক	وَحْدَه
এবং	و	কোন শরিক নেই	لَا شَرِيْكَ

ব্যাখ্যা: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বা আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই" এ কথার মাধ্যমে আমরা স্বীকৃতি দেই যে,

১। আল্লাহই হচ্ছেন বিশ্ব জাহানের একমাত্র খালিক বা স্রষ্টা। বিশ্ব জাহানের প্রতিটি জীব-জন্তু ও অনু-পরমানু তার দয়া এবং অনুগ্রহ বেঁচে আছে। তিনি সবকিছুর প্রতিপালন করেন।

২। এই বিশ্ব জাহানে ইবাদত বা বন্দেগী পাওয়ার একমাত্র উপযুক্ত সত্তা হচ্ছেন আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কারো কোন অধিকার নেই এবাদত বা বন্দেগি পাওয়ার।

৩। পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব কিছু আল্লাহ পাকের বিধান এবং নিয়মের অধীনে চলবে। অন্য কারো নিয়ম এবং বিধান আল্লাহ পাকের নিয়ম এবং বিধানের চেয়ে ঊর্ধ্বে থাকবে না।

ব্যাখ্যা: "মুহাম্মদূর রাসূলুল্লাহ বা মুহাম্মদ সা.ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল" এ কথার অর্থ হল:

১। বিশ্ববাসীর হেদায়েতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল হলেন মুহাম্মদ সা।

২। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও বিভাগে মুহাম্মদ সা. কেই একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ মানুষ হিসাবে মেনে নেয়া ও তার অনুসরণ করা।

৩। তিনি যেভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে বলেছেন এবং করেছেন ঠিক সেভাবেই আল্লাহর ইবাদত করা।

৪। আল্লাহ কে সন্তুষ্ট করার ও আখেরাতে মুক্তি পাওয়ার যে উপায় তিনি বলে দিয়েছেন কেবল সে উপায়েই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা ও আখেরাতে নাজাত পাওয়া সম্ভব।

অনুশীলনী ২১

ক. সঠিক উত্তরের পাশে ঠিক চিহ্ন দাও

১. অজুর শেষে কোন কালেমা পড়তে হয় ?

o কালেমা তাইয়েবা

o কালেমা শাহাদাত

o উভয় কালেমা

২. لَآ اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ অর্থ কি ?

o আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই

o আল্লাহ আমাদের রব

o আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা

৩. 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি' কথাটির আরবি কি?

o لَا شَرِيْكَ

o اشْهَدُ

o وَرَسُولُه

৪. وَحْدَه শব্দের অর্থ কি?

o তিনি এক

o তার কোন শরিক নেই

o তিনি বিশ্ব জাহানের রব

৫. কালেমা শাহাদাতে মুহাম্মদ সা. এর কী বিবরণ আছে ?

o মুহাম্মদ সা. আল্লাহর বান্দা ও রাসূল

o মুহাম্মদ সা. সৃষ্টির সেরা মানব

o মুহাম্মদ সা. আল্লাহর নবী ও রাসূল

পাঠ ২

ঈমান মুজমাল ও মুফাস্‌সাল

ঈমানে মুজমাল (ঈমানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

امَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِه وَصِفَاتِه وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِه

"আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর প্রতি, যেভাবে তিনি তার নাম সমূহ এবং গুণাবলির দ্বারা (বিদ্যমান আছেন) আর আমি তার সকল বিধানাবলী কে মনে প্রাণে গ্রহণ করলাম।"

বাংলা	আরবি	বাংলা	আরবি
তার নাম সমূহ দ্বারা	بِاَسْمَائِه	আমি ঈমান আনলাম	امَنْتُ
তার গুণাবলির দ্বারা	صِفَاتِه	আল্লাহর প্রতি	بِاللّٰهِ
আমি গ্রহণ করলাম	قَبِلْتُ	যেভাবে	كَمَا
তার সকল বিধানাবলী	جَمِيْعَ اَحْكَامِه	তিনি	هُوَ

ঈমানে মুফাস্‌সাল (ঈমানের বিস্তারিত বিবরণ)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِه وَكُتُبِه وَ رُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِه وَشَرِّه مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَالْمَوْتِ

““আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাগণের প্রতি, তার নাযিলকৃত কিতাব সমূহের প্রতি, তার প্রেরিত রাসূলগণের প্রতি, শেষ দিনের প্রতি, তাকদিরের প্রতি, যার ভালো এবং মন্দ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং মৃত্যুর পরে পুণরায় জীবিত হওয়ার প্রতি।”

বাংলা	আরবি	বাংলা	আরবি
শেষ দিন	الْيَوْمِ الْاٰخِرِ	এবং	وَ
তাকদির	الْقَدْرِ	তার ফেরেশতাগণ	مَلٰئِكَتِه
যার ভালো	خَيْرِه	কিতাব সমূহ	كُتُبِ
পুনরায় জীবিত হওয়া	الْبَعْثِ	রাসূলগণ	رُسُلِ

ঈমানে মুফাসসালের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:

আল্লাহ: তিনি বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও একমাত্র নিয়ন্ত্রক। মানুষকে তার প্রতিটি কাজের জন্য তার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

ফেরেশতা: আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। বিশ্ব জাহানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহর কর্মচারী হিসেবে তারা কাজ করেন। তাদের স্বাধীন কোনো ইচ্ছা নেই। তারা কখনো আল্লাহর অবাধ্য হতে পারেন না।

কিতাব সমূহ: মানুষের হেদায়েত এবং পথ নির্দেশনার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক কিতাব এসেছে। এগুলোর মধ্যে তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কোরআন প্রসিদ্ধ। কোরআন সর্বশেষ কিতাব। এখন একমাত্র নির্ভুল পথ হলো কোরআনের পথ।

রাসূলগণ: মানব জাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ কিছু মহামানবকে মানুষের মধ্য থেকেই নির্বাচন করেছেন। নিজ দায়িত্বে তাদেরকে ভুল ত্রুটি থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। তারা তাদের উত্তম আখলাক ও চরিত্র দিয়ে মানুষদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন। শেষ রাসূল হলেন মুহাম্মদ সা.ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। জান্নাতে যেতে হলে কিয়ামত পর্যন্ত তাকেই অনুসরণ করতে হবে।

শেষ বিচারের দিন: একদিন এ দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহর সম্মুখে সকলকে গিয়ে হাজির হতে হবে।

কদর: দুনিয়াতে যা কিছু ঘটে ভালো কিংবা মন্দ সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ইচ্ছায় ঘটে। কোন কিছুই আল্লাহর পরিকল্পনার বাহিরে ঘটে না। আল্লাহ বলেন:

“নিশ্চয়ই সকল জিনিস আমরা সৃষ্টি করেছি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে (নির্দিষ্ট পরিমাপ এবং প্রয়োজন অনুসারে)”

আরবি শব্দ কদর কিংবা তাকদির এর সাধারণ অর্থ করা হয় ভাগ্য। এটা এ শব্দের পরিপূর্ণ অর্থ নয়। কদর শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিমাপ। আল্লাহর সৃষ্টি নির্দিষ্ট পরিমাপ এবং পরিমাণ অনুযায়ী আবর্তিত হয়। যখন যেথায় যতটুকু হওয়া প্রয়োজন আল্লাহ ততটুকুই করেন। কিছু বিষয় আমাদের চোখের সামনে দুর্ঘটনা বলে মনে হয়। আল্লাহর জ্ঞান অনুযায়ী সেগুলো দুর্ঘটনা নয় বরং তার পূর্বপরিকল্পনার অংশ। আমাদের দৃষ্টিতে যা অকল্যাণকর আল্লাহর জ্ঞান অনুযায়ী তা হয়ত কল্যাণকর আর আমাদের কাছে যা কল্যাণকর হয়তবা আল্লাহর কাছে তা অকল্যাণকর। যা কিছু দুনিয়াতে সংগঠিত হয় তাতেই কল্যাণ নিহিত এই বিশ্বাস মুমিন ব্যক্তিকে রাখতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা আমাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবো। আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য সঠিকভাবে আনজাম দেওয়া ও আল্লাহ পাকের উপর ভরসা রাখা তাকদীরের একটি অংশ।

পুনরুজ্জীবন: মৃত্যুর পর প্রতিটি মানুষকে আবারও জীবিত করা হবে। তাদের দুনিয়ার সকল কাজের হিসাব নেয়া হবে। ভালো কাজের ভালো প্রতিদান ও মন্দ কাজের জন্য মন প্রতিদান ভোগ করতে হবে।

অনুশীলনী ২২

ক. সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর: উপযুক্ত ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

<u>সত্য</u> <u>মিথ্যা</u>

☐ ☐ ঈমানে মুজমালে ঈমানের সাতটি বিষয় উল্লেখ আছে।

☐ ☐ আরবিতে ‘ফেরেশতাদের’ বলাহয় ‘মালাইকা ‘

☐ ☐ ‘اَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ’ মানে তাকদির

☐ ☐ আরবিতে ‘ভালো ও মন্দ’ বুঝতে ‘خَيْرٍ وَشَرٍ’ শব্দদ্বয় ব্যাবহৃত হয়।

☐ ☐ আসমানী কিতাবগুলোর মধ্যে ৫ খানা প্রসিদ্ধ।

পাঠ ৩

খাওয়ার দুয়া ও আদাব

আল্লাহ আমাদের রিজিক দাতা। তিনি আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করেন। আমরা যা কিছু খাই, পান করি কিংবা উপভোগ করি সবই আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে লাভ করে থাকি। তাই কোন কিছু খাওয়া বা পান করার সময় আল্লাহকে স্মরণ করা আমাদের উচিত। এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করলে আল্লাহ নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেন এবং তাতে বরকত দেন করেন।

খাওয়ার শুরুতে দুয়া

بِسْمِ اللَّهِ

'আল্লাহর নামে (শুরু করলাম)'

খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র পড়ার দুয়া

بسمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وآخرِهِ

'ইহার (খাওয়ার) শুরু ও শেষ আল্লাহর নামে।'

খাওয়ার শেষে দুয়া

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের খাওয়ালেন এবং পান করালেন আর আমাদের করেছেন মুসলিম।'

বাংলা	আরবি	বাংলা	আরবি
শুরু	أَوَّلِ	নামে	بسمِ
সকল প্রশংসা	الْحَمْدُ	ও শেষ	وآخرِهِ
যিনি	الَّذِي	আল্লাহর	لِلَّهِ
পান করালেন	سَقَانَا	আমাদের খাওয়ালেন	أَطْعَمَنَا
মুসলিম	مِنَ الْمُسْلِمِينَ	আমাদের করেছেন	جَعَلَنَا

খাওয়ার আদবগুলো নিম্নরূপ:

১। খাওয়ার পূর্বে হাত ধুয়ে নেয়া।

২। খাবার থেকে প্রাপ্ত শক্তি আল্লাহর ইবাদত ও ভালো কাজে লাগানোর নিয়ত করা।

৩। খাওয়ার সময় পিছনে ঠেস দিয়ে না বসা।

৪। ডানহাতে খাবার গ্রহণ করা।

৫। খাবার গ্রহণের সময় নাক দিয়ে ঘ্রাণ না নেয়া কিংবা খাবারে ফুঁক না দেওয়া।

৬। খাবারের ত্রুটি না খোঁজা এবং সমালোচনা না করা।

৭। খাবার অপচয় না করা ও চাহিদার চেয়ে কম খাওয়া।

৮। কোন খাবার নিচে পড়ে গেলে তা তুলে এনে ধুয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করা।

৯। পরিবারের সদস্যরা একসাথে বসে খাওয়া।

১০। খাওয়ার পরে আবারও ভালো করে হাত ধুয়া।

অনুশীলনী ২৩

ক. নিচের ঘরে রক্ষিত উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ধুয়ে	সমালোচনা	খাওয়ালেন	ঠেস	ইবাদত	একসাথে	আল্লাহর	কম

১. খাবারের ত্রুটি না খোঁজা এবং --------- না করা।

২. ---------- নামে শুরু করলাম।

৩. পরিবারের সদস্যরা ------- বসে খাওয়া।

৪. খাওয়ার সময় পিছনে ------- দিয়ে না বসা।

৫. কোন খাবার নিচে পড়ে গেলে টা তুলে এনে ------ খাওয়ার ব্যবস্থা করা।

৬. খাবার অপচয় না করা ও চাহিদার চেয়ে -------খাওয়া।

৭. খাবার থেকে প্রাপ্ত শক্তি আল্লাহর ---------- ও ভালো কাজে লাগানোর নিয়ত করা।

৮. সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের -------- এবং পান করালেন।

পাঠ ৪

ঘুমের দুয়া ও আদাব

আমরা ক্লান্তি দূর করতে ও কাজের নতুন উদ্যম পেতে প্রতিদিন ঘুমাতে যাই। ঘুম আল্লাহর একটি নিয়ামত ও শান্তি লাভের অন্যতম মাধ্যম। আবার এই ঘুম আমাদেরকে মৃত্যু ও আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আল কুরআনে ঘুমকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাই প্রতিদিন ঘুমানোর আগে ও ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর নাম স্মরণ করা ঈমানদার ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য।

ঘুমানোর পূর্বের দুয়া

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

‘হে আল্লাহ! তোমার নামে (সাময়িকভাবে) মরে যাচ্ছি এবং তোমার নামেই জীবিত হব’

ঘুম থেকে ওঠার পরে দুয়া

الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

‘সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ যিনি আমাদেরকে (সাময়িক) মৃত্যু দানের পর আবার জীবন দান করলেন আর তার কাছেই আমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে’।

বাংলা	আরবি	বাংলা	আরবি
সকল প্রশংসা	الحَمْدُ	হে আল্লাহ	اَللّٰهُمَّ
আমাদের জীবন দিলেন	أَحْيَانَا	তোমার নামে	بِاسْمِكَ
পর	بَعْدَ	মরে যাচ্ছি	أَمُوتُ
আমাদেরকে মৃত্যু দানের	مَا أَمَاتَنَا	এবং জীবিত হব	وَأَحْيَا
পুনরুজ্জীবিত করা	النُّشُورُ	তার কাছে	إِلَيْهِ

ঘুমানোর পূর্বে করণীয় আদবগুলো

১। মিসওয়াক দিয়ে দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করে নেয়া।

২। ঘুমানোর পূর্বে ওযু করে নেয়া।

৩। ঘুমানোর আগে এশার নামাজ আদায় করা।

৪। বিছানা ঝেড়ে পরিষ্কার করা।

৫। ডান কাত হয়ে গালের নিচে ডান হাত দিয়ে ঘুমানো।

৬। পেটের ওপর ভর করে না ঘুমানো।

৭। ঘুমানোর পূর্বে ঘরের বাতি ও আগুন নিভিয়ে নেয়া।

অনুশীলনী ২৪

ক. নিচের ঘরে রক্ষিত উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

এশার	মৃত্যু	জীবিত	পেটের	ডান	ঝেড়ে	দাঁত	আগুন

১. ঘুমানোর আগে -------- নামাজ আদায় করা।

২. ডান কাত হয়ে গালের নিচে ------ হাত দিয়ে ঘুমানো।

৩. ঘুমানোর পূর্বে ঘরের বাতি ও -------- নিভিয়ে নেয়া।

৪. --------- ওপর ভর করে না ঘুমানো।

৫. বিছানা ------- পরিষ্কার করা।

৬. সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ যিনি আমাদেরকে -------দানের পর আবার জীবন দান করলেন।

৭. মিসওয়াক দিয়ে --------- ও মুখ পরিষ্কার করে নেয়া।

৮. হে আল্লাহ তোমার নামে মরে যাচ্ছি এবং তোমার নামেই -------হব।

পাঠ ৫

সালাম ও কুশল বিনিময়

সালামের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয় এবং শান্তি-সম্প্রীতি তৈরি হয়। মহান আল্লাহ প্রথম মানুষ হিসেবে আদম আ.-কে সৃষ্টি করেন। এরপর ফেরেশতা কর্তৃক তাকে অভ্যর্থনা জানানোর আয়োজন করেন। আদম আ. ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে 'আস-সালামু আলাইকুম' বললে ফেরেশতারা জবাবে বলেন, 'আস-সালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ'। আর সেই দিন থেকেই সালাম আদান প্রদানের মাধ্যমে কুশল বিনিময়ের রীতি চালু হয়ে আসছে।

এক মুসলিম আরেক মুসলিমের সাক্ষাতে বলবে

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

অর্থ: আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

উত্তরে অপর মুসলিম বলবে

وَعَلَيْكُمُ ٱلسَّلَامُ وَرَحْمَةُ ٱللَّـهِ

অর্থ: আপনার উপরও শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

বাংলা	আরবি	বাংলা	আরবি
ও	وَ	শান্তি	ٱلسَّلَامُ
রহমত	رَحْمَةُ	আপনার উপর	عَلَيْكُمْ
আল্লাহর রহমত	رَحْمَةُ ٱللَّـهِ	আপনার উপরও	وَعَلَيْكُمُ

সালাম ও কুশল বিনিময়ের ক্ষেত্রে সুন্নত কাজগুলো হলো

১। অন্যের অপেক্ষা না করে সাক্ষাতে প্রথমেই নিজে সালাম দেওয়া।

২। সালামের উত্তরে কেবল হাত পা বা আঙ্গুল নাড়ানো যথেষ্ট নয়।

৩। সালামের উত্তরে সমপরিমাণ শব্দ বা তার চেয়ে বেশি বলা।

৪। পরিচিত ও অপরিচিত উভয় শ্রেণীর লোকদের সালাম দেবে।

৫। পায়ে হাটা ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে আগে সালাম দেবে।

৬। আরোহী ব্যক্তি পায়ে চলা ব্যক্তিকে আগে সালাম দেবে।

৭। দলবেঁধে চলা লোকদের ছোট দল বড় দল কে আগে সালাম দেবে।

৮। বয়সে ছোটরা বয়সে বড়দেরকে আগে সালাম দেবে।

৯। যখন সালাম দেবে তখন সকলকেই সম্বোধন করবে।

১০। কোন ঘরে বা কক্ষে প্রবেশকালে প্রথমেই উচ্চস্বরে সালাম দেবে।

১১। সালাম দানকালে লোকজনের মুখের দিকে হাসি মুখে তাকাবে।

অনুশীলনী ২৫

ক. সঠিক উত্তরটি বৃত্ত দ্বারা আবৃত্ত কর

১. কারো সাক্ষাতে **আগে / পরে** সালাম দেওয়া।

২. **কেবল পরিচিত / পরিচিত ও অপরিচিত** উভয় কে সালাম দেবে।

৩. কোন ঘরে প্রবেশকালে **উচ্চস্বরে / নিম্নস্বরে** সালাম দেবে।

৪. ছোট **দল /বড়** দল আগে ছোট **দল / বড়** দল কে সালাম দেবে।

পাঠ ৬

হাঁচি ও তার উত্তর প্রদান

হাঁচি মানুষের দেহকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। হাঁচির মাধ্যমে মানুষের দেহ থেকে বিভিন্ন জীবাণু বের হয়ে যায়। যেহেতু হাঁচির মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে রোগ জীবাণু হতে রক্ষা করেন, তাই আমরা তার প্রশংসা করি এবং বলি, আলহামদুলিল্লাহ অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর।

হাঁচি এলে আলহামদুলিল্লাহ পড়া সুন্নত। আবার কেউ হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ পড়লে, তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলাও সুন্নত। তবে কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' না বললে তার জবাব দেয়া তথা ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা লাগবে না।

কারো হাঁচি আসলে বলবে

الحَمْدُ للَّهِ

'সকল প্রশংসা আল্লাহর।'

হাঁচির দুয়া 'আলহামদুলিল্লাহ' শুনলে বলবে

يَرْحَمُكَ اللَّهُ

'আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন।'

প্রতি উত্তরে হাঁচি দাতা বলবে

يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، ويُصْلِحُ بَالَكُمْ

'আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং তোমার অবস্থা ভালো করে দিন।'

বাংলা	আরবি	বাংলা	আরবি
এবং ভালো করে দিন	وَيُصْلِحُ	আল্লাহর	لِلَّهِ
তোমার অবস্থা	بَالَكُمْ	তোমার প্রতি রহম করুন	يَرْحَمُكَ
তোমাকে	كُمُ	সঠিক পথ প্রদর্শন করুন	يَهْدِي

হাচির ক্ষেত্রে করণীয় সুন্নাহ আদবগুলো হল

১। হাঁচি আসলে হাতের তালু বা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখা।

২। সাধ্যমত আওয়াজ কে ছোট রাখার চেষ্টা করা।

৩। কারো মুখের সম্মুখে হাঁচি না দেয়া।

অনুশীলনী ২৬

ক. উপযুক্ত ঘরে টিক চিহ্ন দাও।

	সঠিক আচরণ	ভুল আচরণ
হাঁচির সময় আলহামদুলিল্লাহ বলা		
অন্যের মুখের সামনে হাঁচি দেয়া		
হাঁচি দেওয়ার সময় মুখ খুলে রাখা		
বড় আওয়াজে হাঁচি দেওয়া		
হাঁচি দানকারীকে তিরস্কার করা		

পাঠ ৭

ধন্যবাদ জানানো

মুসলিম হিসাবে আমরা এজন্যই উত্তম যে, আমাদেরকে মানুষের উপকার সাধনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব উপকারে রয়েছে বহুবিদ কল্যাণ। এর মাধ্যমে পারস্পারিক ভালোবাসা ও হৃদ্যতা তৈরী হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। মানুষের উপকার সাধনের অনেকগুলো পন্থা রয়েছে। যেমন কল্যাণের পথে আহবান করা, ভালো উপদেশ ও পরামর্শ দেয়া এবং উপহার দেয়া ইত্যাদি। কেউ কারো উপকার করলে উপকার সাধনকারী ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জানানো উচিত।

কাউকে ধন্যবাদ জানাতে বলা

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا

'আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিফল দান করুন'।

ধন্যবাদ জানানোর ক্ষেত্রে করণীয় সুন্নাহ আদবগুলো হল,

১। উপকারী ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জানানো উচিত, এমনকি খুব ছোট-খাটো উপকার হলেও।

২। উপকারী ব্যক্তির সাধ্যমত উপকার করার মাধ্যমে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।

৩। উপকারী ব্যক্তির উপকার করা না গেলে, অন্তত পক্ষে তার জন্য দুয়া করা উচিত।

৪। গৃহীত উপহারটি যথাযথভাবে ব্যবহার করা এবং এটাকে তুচ্ছ না ভাবা।

৫। তোমার প্রতি কারো উপকারকে কখনো অবহেলা করবে না বা গোপন রাখবে না।

৬। কেউ কোন উপহার দিলে তা কখনো ফিরিয়ে দেবে না।

৭। কাউকে কোন উপহার দিয়ে তা কখনো ফিরিয়ে আনবে না।

৮। কাউকে ধন্যবাদ দেওয়ার সময় হাস্যোজ্জ্বল চেহারা দেখানো উচিত।

৯। কাউকে ধন্যবাদ দেয়ার সময় স্মরণ রাখবে, আল্লাহই তার দ্বারা তোমার উপকার করিয়েছেন। অতএব আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে কখনো ভুলবে না।

অনুশীলনী ২৭

ক. উপযুক্ত ঘরে ঠিক চিহ্ন দাও।

	সঠিক আচরণ	ভুল আচরণ
গৃহীত উপহারটি যথাযথভাবে ব্যবহার করা		
উপহার দিয়ে তা ফিরিয়ে আনা		
ধন্যবাদ দেওয়ার সময় হাস্যোজ্জ্বল চেহারা		
অন্যের ছোট-খাটো উপকার স্মরণ না রাখা		
উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো		
অন্যের উপহার ফিরিয়ে দেয়া		
উপকারীর জন্য অন্তত পক্ষে দুয়া করা		

পাঠ ৮

গুরুত্বপূর্ণ ইসলামিক অভিব্যক্তি

প্রতিদিন আমাদের আশেপাশে অনেক কিছু ঘটছে। এসব নিত্যনতুন ঘটনা আমাদের প্রভাবিত করছে। আমাদের জীবনে নিয়ে আসছে সুখ, দুঃখ, আশা ও হতাশা। ফলে আমরা বাধ্য হই আমাদের মনের আবেগ ও আকুতি পেশ করতে। তবে এসব ক্ষেত্রে কিভাবে আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করতে হবে তা ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি নির্দিষ্ট কিছু ইসলামী অভিব্যক্তি। এসব অভিব্যক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জন করতে পারি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সহযোগিতা। লাভ করতে পারি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ। নিম্নে বহুল ব্যাবহৃত কিছু ইসলামী অভিব্যক্তি অর্থসহ তুলে ধরা হলো:

১। কোন কিছু শুরু করার সময় বলবে

بِسْمِ اللّٰهِ

‘আল্লাহর নামে শুরু করলাম’।

২। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলবে

ٱلْحَمْدُ لِلَّـهِ

‘সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য’।

৩। আশ্চর্য জনক কিছু ঘটে গেলে বলবে

سُبْحَانَ اللّٰهِ

‘আল্লাহ পরিপূর্ণ ও পবিত্র’।

৪। আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করতে বলবে

اللّٰهُ أَكْبَرُ

'আল্লাহ মহান'।

৫। ভবিষ্যতে কিছু করার ইচ্ছে করলে বলবে

إِنْ شَاءَ ٱللَّـٰهُ

'যদি আল্লাহ চাহেন'।

৬। কিছু অর্জিত হলে বলবে

مَا شَاءَ ٱللّٰهْ

'যেভাবে আল্লাহ চেয়েছেন সেভাবে হয়েছে'।

৭। কারো কল্যাণ কামনা করতে বলবে

بَارَكَ ٱللَّـٰهُ فيك

'আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন'।

৮। কোন বিষয়ে অনুশোচনা পেশ করতে বলবে

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

'আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই'।

অনুশীলনী ২৮

ক. বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিল দাও।

বাম পাশ		ডান পাশ
ভবিষ্যতে কিছু করার ইচ্ছে করলে বলবে		بَارَكَ ٱللَّـٰهُ فيك
‘*আল্লাহর নামে শুরু করলাম*’-এর আরবি হল		আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।
কারো কল্যাণ কামনা করতে বলবে		بِسْمِ اللّٰهِ
أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ অর্থ		إِنْ شَاءَ ٱللَّـٰه
আশ্চর্য জনক কিছু ঘটে গেলে বলবে		সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।
আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বলবে		اللّٰهُ أَكْبَرُ
আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করতে বলবে		سُبْحَانَ اللّٰهِ

কাসাসুল আম্বিয়া
(নবীদের জীবনী)

মানুষের প্রতি নবী প্রেরণ

আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে পথ দেখানোর জন্য যুগে যুগে অনেক নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। প্রতি যুগে প্রতিটি জাতির কাছে কোন না কোন নবী এবং রাসূল এসেছিলেন।

নবীরা ছিলেন সর্বোচ্চ সম্মান ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তারা ছিলেন আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত এবং তার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য আল্লাহ কর্তৃক প্রশিক্ষিত। সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। তারা এতই পবিত্র জীবন যাপন করতেন যে তারা গুনাহ করতেন না এবং আল্লাহ পাকের কোন আইন লঙ্ঘন করতেন না। আর কখনো তাদের জীবনে অনিচ্ছাকৃত এক দুটি বিচ্যুতি ঘটলেও আল্লাহ সাথে সাথে তাদেরকে শুধরে নিয়েছেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলদের এই প্রতিনিধিত্ব ছিল আসমান এবং জমিনের মধ্যে, আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সেতু বন্ধন। তার মানে হচ্ছে মানুষকে সংশোধন করে উন্নত মানুষে রূপান্তর করা সম্ভব এবং মানুষের মধ্যে ভালো হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য হলো এটা নিশ্চিত করা যে, মানুষ কি জানে এবং কি তার জানা উচিত, মানুষ কি করছে এবং তার কি করা উচিত। মানুষ যেন আল্লাহ প্রদত্ত সত্য পথটি জানতে পারে এবং সে পথে চলতে পারে এবং মন্দ ও শয়তানের পথ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

মানুষের প্রতি নবী ও রাসূল প্রেরণ প্রমাণ করে, আল্লাহ মানুষকে ভালোবাসেন বলে তিনি তাদেরকে সত্য পথে পরিচালিত করতে চান, তিনি চান তাদের বিশ্বাস এবং কর্মকে পরিশুদ্ধ করতে। এটা আল্লাহ পাকের ইনসাফের দাবি যে, মানুষকে প্রথমে পথপ্রদর্শন করেন তারপর সেই প্রদর্শিত পথে জীবন যাপন করলো কিনা তার জন্য তাদেরকে জবাবদিহির মুখোমুখি করেন। তিনি নবী পাঠিয়ে লোকদেরকে সতর্ক করেন। এই সতর্কবাণী শুনে যদি মানুষ সংশোধিত না হয় তাহলে তাদেরকে তিনি শাস্তি দেন। সকল নবী ও রাসূল একই আল্লাহর পক্ষ থেকে

এসেছিলেন। বিধায় তাদের কথা এবং কাজের মধ্যে ছিল এক পূর্ণাঙ্গ মিল। তারা সকলেই এক আল্লাহর প্রতি লোকদেরকে আহ্বান করেছেন। এক আল্লাহর বন্দেগী করতে বলেছেন। বলেছেন যে মৃত্যুর পরে সকলকে আল্লাহর নিকট তাদের জীবনের সকল কাজের হিসাব দিতে হবে। সেই সাথে মুসলমানরা এটাও বিশ্বাস করে যে, সর্বশেষ নবী হলেন মুহাম্মদ সা.। তারপরে দুনিয়াতে আর কোন নবী এবং রাসূল আসবেন না। অতএব তার আনিত শিক্ষাই হচ্ছে মানবতার জন্য চূড়ান্ত শিক্ষা।

পাঠ ১

দুনিয়ার সূচনা

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে পারবে,

- *কিভাবে ও কখন সৃষ্টির সূচনা হল ও কে সূচনা করলেন*
- *আল্লাহ সর্বদা ছিলেন, সর্বদা আছেন এবং সর্বদা থাকবেন*
- *আল্লাহ তার গুণাবলির প্রকাশ ঘটাতেই সৃষ্টি করেছেন*
- *আমাদের এই পৃথিবী ছাড়াও আরো অনেক জগত রয়েছে*
- *সৃষ্টি জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে ধন্যবাদ ও প্রশংসা করণের নিমিত্তে*
- *আল্লাহর সৃষ্টির মূল্যায়ন করার ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র মানুষের*

দুনিয়ার সূচনা

প্রথমে আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুই ছিল না। তারপর আল্লাহ সৃষ্টিকার্য সূচনা করলেন। আল্লাহ হলেন উত্তম স্রষ্টা, সৃষ্টি করাই তার কাজ।

আল্লাহ প্রথমে সৃষ্টি করলেন ফেরেশতা, তারপর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী। অতঃপর আল্লাহ সৃষ্টি করলেন মহাসাগর, পাহাড়, উদ্ভিদ এবং প্রাণীকুল।

আল্লাহ এসব সৃষ্টি করলেন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে, কারণ তিনি হচ্ছেন নির্ভুল স্রষ্টা। আল্লাহ নিজে অত্যন্ত সুন্দর, তাই তার সৃষ্টি অসাধারণ সুন্দর ও অতুলনীয়। আল্লাহ তার সৃষ্টি জগতের সবই সৃষ্টি করলেন অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে। কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ বা প্রশংসা করার মত কোন মানুষ তখন ছিল না।

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী একসঙ্গে মিলিত ছিল; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিয়েছি।

সূরা আম্বিয়া: ৩০

অনুশীলনী ২৯

ক. নিচের তালিকা হতে উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শুন্যস্থান পূরণ কর।

উত্তম	আল্লাহ	প্রাণীকুল	নিখুঁতভাবে
ফেরেশতা	বিস্ময়করভাবে	অসাধারণ	মানুষ

প্রথমে .... ছাড়া কোন কিছুই ছিল না।

আল্লাহ হলেন .... স্রষ্টা, সৃষ্টি করাই তার কাজ।

আল্লাহ প্রথমে সৃষ্টি করলেন............, তারপর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী।

অতঃপর আল্লাহ সৃষ্টি করলেন মহাসাগর, পাহাড়, উদ্ভিদ এবং ....।

আল্লাহ এসব সৃষ্টি করলেন অত্যন্ত ...., কারণ তিনি হচ্ছেন নির্ভুল স্রষ্টা।

আল্লাহর নিজে অত্যন্ত সুন্দর, তাই তার সৃষ্টি ....সুন্দর ও অতুলনীয়।

আল্লাহ তার সৃষ্টি জগতের সবই সৃষ্টি করলেন অত্যন্ত ....।

কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ বা প্রশংসা করার মত কোন ....তখন ছিল না।

খ. নিচের বাক্যটি সুন্দর করে ৩ বার লিখ।

“প্রথমে আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুই ছিল না।”

১. ____

____

২. ____

____

৩. ____

____

পৃথিবীর সূচনা ও আল্লাহর ক্ষমতা

অনেক অনেক আগের কথা। হাজার হাজার বছর আগে। তখন এ সুন্দর পৃথিবী ছিল না। ছিলনা কোন গরম বা ঠান্ডা। কোথাও ছিল না সূর্যের কোন আলো ও চন্দ্রের কোন স্নিগ্ধতাও। ছিলনা তারকারাজীর মিটমিট উজ্জ্বলতা। দেখার মত কিছুই চোখে পড়তো না। তবে তখনও একজন ছিলেন, তিনি হলেন আল্লাহ।

সে অনেক আগে। হাজার বছর আগে। এ পৃথিবীতে ছিল না ছায়া দানকারী কোন গাছ-গাছালি। ছিলনা সাগরের বুকে কোন ঢেউয়ের অস্তিত্ব। নিরবে বয়ে যাওয়া শান্ত নদী ও ছিল না। কিচিরমিচির আওয়াজ তুলে গান গাইবে এমন কোন পাখিও ছিল না। রংবেরঙের প্রজাপতিও চোখে পড়তো না। আর পানিতে মাছের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যেত না। তবে তখনও একজন ছিলেন, তিনি হলেন আল্লাহ।

নয়ন জুড়ানো পৃথিবী, সুনীল আকাশ, সুউচ্চ পাহাড়-পর্বত, বহমান নদী-নালা কোন কিছুই এক সময় ছিলনা। তবে তখন ও আল্লাহ ছিলেন। এ বিশ্ব জগতের সূচনার পূর্বে কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। অস্তিত্ব ছিল একজনের, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমতাবান। তিনি যা চান তাই করতে পারেন। তিনি 'হও' বলার সাথে সাথেই হয়ে যায়।

আল্লাহ তখন সৃষ্টিকর্ম শুরু করলেন। কারণ তিনি হচ্ছেন একজন নির্ভুল স্রষ্টা। তিনি যা সৃষ্টি করেন নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেন। যখন তিনি বললেন, 'হও' সাথে সাথেই অনেক কিছু হয়ে গেল। আল্লাহ তার সৃষ্টিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন। কারণ, আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। আল্লাহ তার সৃষ্টিকে অত্যন্ত যত্নসহকারে সৃষ্টি করেছেন। কারণ তিনি একজন যত্নশীল স্রষ্টা।

আল্লাহ সৃষ্টি করলেন পূতপবিত্র ফেরেশতা। তাদেরকে সৃষ্টি করলেন নূর বা আলো থেকে। ফেরেশতারা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য। তারা নির্ভুলভাবে আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে সক্ষম। তারা কখনো আল্লাহর অবাধ্য হন না।

এরপর আল্লাহ সৃষ্টি করলেন মহাকাশ সমূহ এবং বহু জগত। আল্লাহ সৃষ্টি করলেন আমাদের মহাবিশ্ব। আল্লাহ সৃষ্টি করলেন আমাদের সূর্য এবং আমাদের পৃথিবী।

আল্লাহ সূর্যকে নির্দেশ দিলেন পূর্ব দিকে উদিত হয়ে পশ্চিম দিকে অস্ত যেতে। আল্লাহ সূর্যের সোনালী আলোকে নাম দিলেন দিন। আর সূর্যের অনুপস্থিতিতে অন্ধকারের অস্তিত্বকে নাম দিলেন রাত বলে। সূর্যের উষ্ণ আলো পৃথিবীতে ছেয়ে গেল। তারপর আল্লাহ পানি সৃষ্টি করলেন যা প্রবাহিত হতে থাকলো। প্রবাহিত পানি যখন এক বিশাল স্থানে জড়ো হল তখন একে নাম দেওয়া হল সাগর ও মহাসাগর। আর যে উঁচু ভূমিতে পানি নেই তার নাম দেয়া হলো স্থল।

অতঃপর আল্লাহ স্থলভাগে সবুজ গাছপালা সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি করলেন লতাগুল্ম। সৃষ্টি করলেন হরেক রকম গাছপালা যা পৃথিবীকে ঢেকে দিল। এতকিছু করতে আল্লাহ শুধু একটি শব্দ ব্যবহার করলেন 'হও' আর সাথে সাথেই সবকিছু হয়ে গেল। পৃথিবী সজ্জিত হলো ফুলে ফলে। ফল থেকে বীজ এল। বীজ থেকে নতুন নতুন গাছ গাছালি জন্মাতে থাকলো। এরপর বছরের পর বছর পৃথিবীতে সবুজ শ্যামল তরুলতা জন্মাতে থাকলো।

আল্লাহ 'হও' বলার সাথে সাথেই নদী এবং সাগরে নানান রংবেরঙের মাছ ও কীট পতঙ্গের জন্ম হল। 'হও' বলতেই অস্তিত্ব লাভ করল ছোট ছোট মাছ থেকে শুরু করে বিশালাকারের তিমি পর্যন্ত। লক্ষ লক্ষ প্রকার ও ধরনের অন্যান্য জন্তুও সাগরে অস্তিত্ব লাভ করল।

আল্লাহ ‘হও’ বলার সাথে সাথেই অসংখ্য অগণিত পাখি উড়ে গেল। নানান রঙ্গ ও আকারের পাখিগুলো ভিন্ন ভিন্ন সুরে গাইতে থাকলো স্রষ্টার গুণগান। এভাবে পৃথিবীতে জানা অজানা হাজারও ধরনের প্রজাতি অস্তিত্ব লাভ করল। অস্তিত্ব পেল পোকামাকড়। বাঘ, সিংহ ও বানরের মতো হাজারও প্রজাতির প্রাণী অস্তিত্ব পেল। সর্বত্রই বিস্ময়। সর্বত্রই সৌন্দর্য বিরাজ করছে।

আল্লাহ বিশ্বকে এমন সুন্দর করে সাজালেন যা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। কিন্তু সেই সৌন্দর্য উপভোগ করবে এমন কোন মানুষ তখন দুনিয়াতে ছিল না। ছিলনা এমন কোন জাতি যারা আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য উপভোগ করবে ও আল্লাহর প্রশংসা করবে।

এই গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্ন লিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক ও অভিভাবক শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন

- আল্লাহ সর্বদা ছিলেন এবং তার কোন সূচনা নেই
- এ বিশ্বজাহান সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুই ছিল না
- আল্লাহ তার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা বলে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে এনেছেন
- আল্লাহ তার নিজের গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে সৃষ্টিকর্ম সম্পাদন করেছেন
- আল্লাহ ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন তার নির্দেশে তার কর্ম পরিচালনার জন্য
- আমাদের এ মহাবিশ্ব ছাড়াও আমাদের অজানা অনেক মহাবিশ্ব রয়েছে

অনুশীলনী ৩০

ক. সত্য-মিথ্যা নির্ণয় কর। যথাযথ ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

সত্য	মিথ্যা	
☐	☐	এ মহা বিশ্বে এক সময় চন্দ্র-সূর্য এসব কিছুই ছিলোনা।
☐	☐	'পৃথিবী' নামক গ্রহ সব সময়ই ছিল।
☐	☐	আল্লাহ প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন জ্বিন তারপর ফেরেশতা।
☐	☐	আল্লাহ সূর্যকে নির্দেশ দিলেন পশ্চিম দিকে উদিত হতে।
☐	☐	নদী ও সাগর সৃষ্টির আগে ছোট বড় সকল মাছ ডাঙায় বাস করত।
☐	☐	সৃষ্টি কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তার অস্তিত্বের জানান দিয়েছেন।
☐	☐	আল্লাহ সৃষ্টি সুন্দর ও নিখুঁত।

পাঠ ২

আদম আ. ও হাওয়া আ.

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে পারবে,

- *আল্লাহ কিভাবে প্রথম মানুষ আদম ও তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন*
- *মানুষ কাদামাটি থেকে সৃষ্ট আর আত্মা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত অশরীরী একটি সৃষ্টি*
- *মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি এবং আল্লাহর দেয়া বিধিমত চলাই তাদের কাজ*
- *কেবল আল্লাহকে ভালোবাসা এবং তার আনুগত্য করাই মানুষের উচিত*
- *শয়তান মানবজাতির শত্রু এবং সে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কাজেই লিপ্ত*
- *সৃষ্টিগতভাবে সকল মানুষই এক জাতি এবং এক আদম ও হওয়ার সন্তান*

আদম আ. ও হাওয়া আ.

আল্লাহ প্রথম মানুষ সৃষ্টি করলেন কাদামাটি থেকে। আল্লাহ তার নাম দিলেন আদম। আল্লাহ আদম এর ভিতর নিজ থেকে রুহ ফুকে দিলেন। তাতে আদম জীবিত হয়ে উঠলেন। আল্লাহ আদমকে সকল সৃষ্টির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন। আদমকে বিশেষ জ্ঞান এবং যোগ্যতা দিলেন। আদম তার জ্ঞান ও যোগ্যতা দ্বারা সকল ভালো কাজ করতে সক্ষম। আল্লাহ আদমকে দুনিয়াতে তার খলিফা নিয়োগ করলেন।

আল্লাহ ফেরেশতা সহ সকল সৃষ্টিকে আদেশ করলেন আদমকে সেজদা দিয়ে সম্মান জানাতে। শয়তান ছাড়া সকল সৃষ্টি আদমকে সেজদা করলো। শয়তান ছিল আগুনের তৈরি জ্বিন আর সে ছিল অত্যন্ত অহংকারী। শয়তান নিজেকে আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাবলো এবং সে আল্লাহর খলিফা হওয়ার অধিক যোগ্য মনে করলো। শয়তান আদমের প্রতি হিংসা পরায়ণ হয়ে তাকে ঘৃণা করতে লাগলো। তাই সে আদমকে সেজদা করল না। আল্লাহ শয়তানকে অভিসম্পাত দিলেন এবং বেহেস্ত থেকে বহিস্কার করলেন।

আদম বেহেশতে সকল কিছু উপভোগ ও শান্তির সাথে বসবাস করতে লাগলেন। জান্নাতে আদমের সবকিছুই ছিল, তবে তার কোন বন্ধু ছিল না। আদম একাকীত্ব অনুভব করলেন। আল্লাহ আদমের পাঁজর হতে একজন মহিলা সৃষ্টি করলেন, যার নাম হল হাওয়া। আল্লাহ হাওয়াকে করলেন আদমের বন্ধু এবং তার স্ত্রী। আদম ও হাওয়া জান্নাতে হাসি খুশির সাথে জীবন যাপন করতে লাগলেন।

আল্লাহ আদম ও হাওয়াকে বেহেশতে সব কিছু উপভোগ করতে বললেন কেবল একটিমাত্র গাছ ছাড়া। আল্লাহ বললেন, এই গাছের ধারে কাছেও তোমরা যেও না এবং এর ফল খেয়োনা। শয়তান এমন একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

শয়তান আদম এবং হাওয়া কে প্ররোচিত করল নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে। আদম এবং হাওয়া আল্লাহর নিষেধের কথা ভুলে গেলেন। তারা উভয়েই বেহেশতের সেই নিষিদ্ধ গাছ থেকে ফল খেয়ে নিলেন। আল্লাহ আদম এবং হাওয়ার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। আদম এবং হাওয়া তাদের ভুল বুঝতে পারলেন এবং তারা সাথে সাথেই আল্লাহর কাছে তওবা করতে লাগলেন। আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান, তাই তিনি তাদের তওবা কবুল করলেন ও তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন।

আল্লাহ অতঃপর আদম এবং হাওয়াকে দুনিয়াতে প্রেরণ করলেন। আদম এবং হাওয়া দুনিয়াতে বহু বৎসর বেঁচে ছিলেন। তাদের অনেক সন্তান সন্ততি হয়েছিল। আদমের সন্তানগণ দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তারা সকলেই আদম ও হাওয়ার সন্তান।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন আল্লাহ ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি পৃথিবীতে খলিফা (আমার প্রতিনিধি) পাঠাতে চাই।

সূরা বাকারা: ৩০

অনুশীলনী ৩১

ক. নিচের ঘরে রক্ষিত ও উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

শয়তান কাদামাটি সন্তান রুহ নিষিদ্ধ
জান্নাতে খলিফা হিংসা অভিসম্পাত তওবা

১. আল্লাহ প্রথম মানুষ আদমকে সৃষ্টি করলেন -------- থেকে।

২. আল্লাহ আদম এর ভিতর নিজ থেকে ------- ফুকে দিলেন।

৩. আল্লাহ আদমকে দুনিয়াতে তার --------- নিয়োগ করলেন।

৪. --------- ছাড়া সকল সৃষ্টি আদমকে সেজদা করলো।

৫. শয়তান আদমের প্রতি -------- পরায়ণ হয়ে তাকে ঘৃণা করতে লাগলো।

৬. আল্লাহ শয়তানকে ------- দিলেন এবং বেহেস্ত থেকে বহিস্কার করলেন।

৭. আদম ও হাওয়া -------- হাসি খুশির সাথে জীবন যাপন করতে লাগলেন।

৮. শয়তান আদম এবং হাওয়া কে প্ররোচিত করল -------- গাছের ফল খেতে।

৯. দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহ তাদের ----------কবুল করলেন ও তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন।

১০. পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তারা সকলেই আদম ও হাওয়ার --------।

আদম ও হাওয়া জান্নাত থেকে পৃথিবীতে

পর্ব ১: জান্নাতের প্রান্তরে

পৃথিবী ছিল খুবই চমৎকার। হরেক রকম গাছ গাছালি, ফুল ও ফলে সুসজ্জিত ছিল এ ধরণী। সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল বিভিন্ন প্রপজাতির পশুপাখি ও কীটপতঙ্গ। নদী ও সাগরে ছিল নানান প্রজাতির মাছ ও জলজ প্রাণীর মেলা। নয়ন জুড়ানো ঝর্ণাধারা পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছিল পৃথিবীর বুকে। উত্তাল সাগরের উর্মি মালা আছড়ে পড়ছিল পৃথিবীর প্রস্তরময় কিনারে। মেঘের ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে সূর্য তার কিরণ ছড়িয়ে দিচ্ছিল সর্বত্র। রাতের আকাশে চাঁদের স্নিগ্ধতা মাতিয়ে তুলছিল প্রজাপতি ও নিশাচর প্রাণীদের। কিন্তু হায় ! কোথায় যেন এক শূন্যতা।

নববধূর সাজে সজ্জিত পৃথিবী যেন চিৎকার করে বলছিল, “*এখানে এমন কেউ কি আছে যে আমাকে দেখে বিস্মিত হবে? আমার অপরূপ সৌন্দর্যের প্রশংসা করবে? আমার মধ্যে লুকায়িত অজস্র ভোগ সামগ্রী উপভোগ করবে?*”

কিন্তু না। কেউ কোন উত্তর দিচ্ছে না। চতুর্দিকে ছিল নিঃশব্দ নীরবতা। পৃথিবী এমন কাউকে চিনত না, যে তাকে ভোগ করবে ও তার রবের গুনকীর্তন করবে। এমনকি ফেরেশতারাও এমন কাউকে জানত না যারা পৃথিবীর সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে পারে এবং তার বিস্ময়কর সম্পদ উপভোগ করতে পারে।

কিন্তু আল্লাহ জানেন। আল্লাহ জানেন তিনি এখানে পাঠাবেন এক বিশেষ সৃষ্টি, যে পৃথিবীর উপর রাজত্ব করবে। তারা হবে এমন এক অনন্য সৃষ্টি যা আগে কেউ দেখেনি। এই সৃষ্টিকে আল্লাহ অভিহিত করলেন ‘মানুষ’ বলে। আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন পৃথিবীর বুক থেকে ভিন্ন ভিন্ন রং ও ধরনের মাটি নিয়ে আসতে। নির্দেশ পাওয়া মাত্র ফেরেশতারা বিচিত্র ধরণের মাটি

নিয়ে ফিরে আসলেন। আল্লাহ সেই মাটিকে পানির সাথে মিশ্রিত করে কাঁদার খামির বানালেন। অতঃপর এ কাঁদাকে একজন মানুষের আকৃতিতে রূপান্তরিত করলেন। তাতে সুঠাম হাত-পা, নিখুঁত চোখ ও কান, সুন্দর নাক এবং নরম ঠোঁট দিলেন। আল্লাহ তাকে আদম নামে অভিহিত করলেন। এরপর আল্লাহ তার ভিতর নিজ থেকে আত্মা ফুঁকে দিলেন। আর সাথে সাথেই প্রথম মানুষটি জীবন লাভ করলো। আদম বলে উঠলেন, আলহামদুলিল্লাহ, সকল প্রশংসা আল্লাহর।

আল্লাহ আদমকে জ্ঞান দান করলেন। আল্লাহ আদমকে দিলেন প্রজ্ঞা এবং সর্বোত্তম ভাবে কাজ করার বহুমুখী প্রতিভা। অতঃপর আল্লাহ ফেরেশতাগণকে বললেন, *"আমি আদমকে পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি করব। সে পৃথিবীতে আমার কাজ করবে। এটা করার জন্য আমি তাকে এমন গুণাবলি দিয়েছি যা অন্য কোন সৃষ্টিকে আমি দেইনি। আদম তাকে দেয়া জ্ঞান ও গুণাবলি দিয়ে সুন্দর পৃথিবী ও তার মধ্যস্থিত সব কিছুকে শাসন করবে"*।

ফেরেশতাগণ বললেন, *"হে আল্লাহ! আদম কি আপনার আনুগত্য এবং ইবাদত করবে যেমন আমরা করে থাকি?"*

আল্লাহ বললেন, *"হা তোমরা তা দেখতে পাবে। আমি আদমকে স্বাধীন ভাবে কাজ করার ক্ষমতাও দিয়েছি যে ক্ষমতা তোমাদের দেইনি।"*

ফেরেশতাগণ যখন এ কথা শুনলেন তখন তারা বিস্মিত হলেন। তারা চিৎকার করে বললেন, হে আল্লাহ, সে হয়তো আপনার অবাধ্যতা করতে পারে। *'হা হয়তো সে তা করতে পারে'*, আল্লাহ সম্মতি জানালেন।

"তাহলে কেন আপনি মানুষকে সৃষ্টি করলেন এবং তাকে পৃথিবীর শাসক বানাবেন, হে আল্লাহ?" ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করলেন। *"আপনি কি পৃথিবীতে এমন একটি সৃষ্টি পাঠাবেন যারা এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্ত ঝরাবে?*

আমরা কি আপনার বাধ্য ও কর্তব্যপরায়ণ নই ? আমরা কি আপনার ইচ্ছামত গুনকীর্তন ও পবিত্রতা বর্ণনা করছিনা? আমরা মনে করি, নতুন সৃষ্টি মানুষ অবশ্যই আপনার আদেশ পালন করবে না। আমাদের মতো আপনার আনুগত্য করবে না। নিঃসন্দেহে তারা যদি কাজ করার স্বাধীনতা পায়, তবে তারা আপনাকে অমান্য করবে।"

আল্লাহ বললেন, *"আমি যা জানি তোমরা তা জান না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে মানুষ পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার উপর কর্তৃত্ব করবে ও শাসন কার্য পরিচালনা করবে। অতএব মাথা নত কর সম্মানের সাথে, আমার সর্বোত্তম সৃষ্টির সম্মুখে"*।

সমস্ত ফেরেশতা আনুগত্যের সাথে মাথা নত করলেন আদম আ.-এর সামনে, এবং সাথে অন্য সকল সৃষ্টিও। কিন্তু এর মধ্যে এমন একটি সৃষ্টি ছিল যে যুগ যুগ ধরে আল্লাহর ইবাদত করে আসছিল, যার মত ইবাদত বন্দেগী ইতিপূর্বে কেউ করেনি। কিন্তু সে আদমকে সম্মান জানাতে অস্বীকার করলো। সে বেঁকে বসলো আর অহংকারে ফেটে পড়লো। সে ছিল আগুনের তৈরী জীন। তার নাম ছিল ইবলিস। ইবলিস আল্লাহর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো। সে হয়ে গেল আল্লাহর অবাধ্য। আল্লাহ ইবলিসকে লালত করলেন।

আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, *"তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছ এবং আমার নিজ হাতে তৈরী সর্বোত্তম সৃষ্টিকে সম্মান জানাতে অস্বীকার করেছো। আমাকে বলো, তুমি কেন আমার আদেশ পালন করনি? কেন আদমের কাছে মাথা নত করনি?"*

ইবলিস তার দুষ্ট কণ্ঠে বললো, *'আমি কেন মাথা নত করব? আমি আদমের চেয়ে উত্তম। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ আগুন থেকে এবং আদম কে সৃষ্টি করেছো*

কাদামাটি থেকে।” আল্লাহ আদম কে যে সম্মান দিয়েছেন তাতে সে ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। কিন্তু ইবলিস বুঝতে পারেনি আদমের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর কাছে কতখানি।

আদম আ. কে আল্লাহ যে অসাধারণ গুণাবলি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার দিকে না তাকিয়ে ইবলিস কেবল আদম সৃষ্টির উপাদান মাটির দিকে তাকালো। তার অহংকার তাকে বোকা বানিয়ে ছাড়লো। ইবলিসের অহংকার এবং অবাধ্যতা আল্লাহকে রাগান্বিত করলো। আল্লাহ বলেন, *“অবিলম্বে এখান থেকে চলে যাও। তোমার উপর আমার লানত কিয়ামত পর্যন্ত।”*

তখন থেকেই ইবলিস কে ডাকা হয় শয়তান, যে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত। সে মানুষের চির শত্রু। রাগান্বিত শয়তান আদমের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার শপথ করে বসলো। শয়তান মনে মনে বলল, *“যে আদমের কারণে আমি আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তার রহমত থেকে বঞ্চিল হলাম, আমি শপথ করছি কিয়ামত পর্যন্ত আদম ও তার সন্তান সকল মানুষকে বিভ্রান্ত করেই ছাড়বো। আমি জাহান্নামে পুড়বো আর আদম ও তার সন্তানগণ আল্লাহর রহমত পাবে, জান্নাতে সুখে থাকবে তা কেমন করে হয়? আমি আমার সাধ্যমত আদম সন্তানদের বড় একটি অংশকে জাহান্নামে নিয়েই ছাড়বো।”* ইবলিসের হিংসা এভাবেই কাজ করছিল।

আল্লাহ আদম (আঃ) এর দিকে ফিরে বললেন, *“এখন যাও এবং জান্নাত উপভোগ করো যা আমি তোমার জন্য প্রস্তুতি করে রেখেছি। কিন্তু শয়তান থেকে সাবধান থেকো, কারণ সে তোমাদের শত্রু। সে কখনও বদলাবে না, সে আজীবন তোমার শত্রতা করেই যাবে। অতএব তার ব্যাপারে সাবধান।”*

পর্ব ২: দুষ্ট শয়তানের ফাঁদে

আল্লাহ আদমকে জান্নাতে বসবাস করতে দিলেন। আদম জান্নাতে সুখ ও শান্তির সাথে সময় কাটাতে লাগলেন। তিনি জান্নাতের সব কিছু উপভোগ করছিলেন। কিন্তু কিছুদিন যেতেই আদম একাকীত্ব অনুভব করলেন। কারণ তার সেখানে কোনো বন্ধুবান্ধব ছিল না। ছিল না কোন পরিবার-পরিজন। আল্লাহ চাইলেন আদমের একাকীত্ব দূর করতে। তাই তিনি আদম থেকেই দ্বিতীয় মানুষ সৃষ্টি করলেন। তবে তিনি ছিলেন একজন মহিলা। তার নাম হলো হাওয়া।

হাওয়াকে দেখে আদম অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আল্লাহ হাওয়াকে আদমের কাছে বিবাহ দিয়ে দিলেন। এখন আদম ও হাওয়া স্বামী-স্ত্রী। তারা একে অন্যের কাছে তাদের মনের ভাব আদান-প্রদান করতে পারেন। সুবিশাল মনোরম জান্নাতে আদম এবং হাওয়া অত্যন্ত সুখের সাথে জীবন অতিবাহিত করছিলেন।

একদিন আল্লাহ আদম এবং হাওয়াকে সম্বোধন করে বললেন, "*তোমরা জান্নাতের সবই উপভোগ করতে পারবে। তবে ঐ যে দেখ একটি গাছ আছে, এটার ফল খাওয়া তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। তোমরা এর ধারে কাছেও যাবে না। এর ফল ছুঁয়েও দেখবেনা। তোমরা যদি এই গাছের ফল খাও তাহলে তোমরা আমার অবাধ্য হয়ে যাবে।*"

সেখানে আরো একজন ছিল, যে ছিল খুবই দুষ্ট, সে আদম এবং হাওয়াকে দেয়া আল্লাহর নির্দেশ গুলো শুনছিল। আর সে মনে মনে দুষ্ট পরিকল্পনা করছিল। সে ছিল হিংসুক। জানো, সে কে? সে হল শয়তান। শয়তান দেখল, আদম এবং হাওয়া জান্নাতের ফুল ফল আলো বাতাস সবই উপভোগ করছেন। সেখানে তাদের কোন কাজ নেই। শুধু আনন্দ করা আর ঘুরে বেড়ানো। কি সুখের জীবন জান্নাতে তাদের। শয়তান হিংসায় জ্বলে উঠলো। শয়তান সিদ্ধান্ত নিল, আদম এবং হাওয়াকে সুখে থাকতে দেবেনা। সে বন্ধু সেজে তাদের কাছে গিয়ে বলল,

“তোমরা তো জান আমি তোমাদের কত ভালবাসি। আমি সবসময় তোমাদের ভালো চাই ও আমি তোমাদের কল্যাণকামী। তোমাদেরকে আমি যে পরামর্শ দেব, তা তোমাদের কল্যাণের জন্যই দেব।”

এ সবই ছিল তার প্রতারণা। তার দুষ্ট পরিকল্পনার অংশ। আদম এবং হাওয়া শয়তানের দুষ্ট পরিকল্পনা বুঝতে পারেননি। শয়তান এবার বলতে লাগল, *“তোমরা কি জান কেন তোমাদের ঐ গাছের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছে? নিশ্চয় তা তোমরা জান না। তোমরা যদি ঐ গাছের ফল খাও তবে তোমরা অমরত্ব লাভ করবে। তোমরা আর কখনো মরবে না। তোমাদের পৃথিবীতে যেতে হবে না। তোমরা অনন্তকাল জান্নাতে সুখে থাকবে।”*

দুষ্ট শয়তানের লোভ জাগানো কথাগুলো শুনে আদম ও হাওয়ার মন গলে গেল। তারা শয়তানের মিথ্যা কথায় প্রলুব্ধ হলেন। আদম ও হাওয়া কিছুক্ষনের জন্য আল্লাহর নিষেধের কথা ভুলে গেলেন। তাই তারা দুজনেই নিষিদ্ধ গাছের দিকে হাত বাড়ালেন। গাছের ফলগুলো নিয়ে এলেন। আর ফলগুলো খেতে লাগলেন।

কিন্তু হায় ! নিষিদ্ধ ফল খাওয়া মাত্রই তাদের শরীর থেকে জান্নাতের পোশাক গুলো ঝরে পড়ল। তারা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে পড়লেন। তখনই তাদের মনে পড়ল আল্লাহ তাদেরকে ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন। আদম ও হাওয়া তখন তাদের লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য জান্নাতের গাছের পাতা টানতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই তারা লজ্জা নিবারণ করতে পারছিলেন না। আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বললেন, *“হে আদম এবং হাওয়া ! আমি কি তোমাদেরকে এই গাছের ফলগুলো খেতে নিষেধ করি নাই? আমি কি বলি নাই, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ? আমি কি বলি নাই, শয়তানের কথায় তোমরা কান দেবে না ? তার কথায় তোমার আমার অবাধ্য হবে না ?”* আদম এবং হাওয়া তাদের ভুল বুঝতে পারলেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। তাদের আর পিছনে যাওয়ার সুযোগ নেই।

পর্ব ৩: ধুলির ধরায় মানব পায়ের ছোঁয়া

আদম ও হওয়া উভয়ে তাদের ভুলের জন্য খুবই লজ্জিত হলেন। তারা মনে মনে খুব কষ্ট পেলেন। কারণ তারা মূলত আল্লাহর অবাধ্য ছিলেন না। আর তারা ছিলেন না শয়তানের মত অহংকারী। তাই বিলম্ব না করেই তারা আল্লাহর কাছে নিজেদের ভুলের স্বীকৃতি দিলেন। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। তারা বলতে লাগলেন, "*হে আল্লাহ আমরা নিজেদের উপর চরম জুলুম করেছি, মহা অন্যায় করেছি। আপনি যদি আমাদের মাফ না করেন, আমাদের ক্ষমা না করেন, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের দলভুক্ত হয়ে যাব*"।

আদম ও হওয়া চোখের পানি ফেলে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "*একটি মারাত্মক অন্যায় আমরা করে ফেলেছি। শয়তান আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছিল। শয়তান তার প্রতারণার জালে আমাদের বন্দি করেছিল। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমাদের প্রতি আপনার রহমত বর্ষণ করুন। আপনি অত্যন্ত দয়ালু ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল*"।

আল্লাহ সত্যিই অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু। তার দয়ার কোন সীমা পরিসীমা নেই। আল্লাহ তার বান্দাদের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। কোন মা তার সন্তানকে যতটুকু ভালোবাসে আল্লাহ তার চাইতে হাজারগুন বেশি তার বান্দাকে ভালোবাসেন। তাই আল্লাহ আদম ও হওয়ার প্রতি তার দয়া ও ক্ষমা দেখালেন। তাদের প্রার্থনা কবুল করলেন। তাদেরকে মাফ করে দিলেন। আল্লাহ তাদের প্রতি তার সন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করলেন। কারণ তারা ছিলেন বিনয়ী। তারা ছিলেন আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আল্লাহ বিনয়ী ও ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের এভাবেই ক্ষমা করে থাকেন।

শয়তান যখন দেখলো আদম এবং হাওয়া উভয়ই আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছেন,তখন সে তাদের প্রতি আরো বেশি ক্ষুব্ধ হলো। সে হতাশ হয়ে পড়ল

এই ভেবে যে, আদম এবং হাওয়া তার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। কিন্তু সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো, আদম ও হাওয়া কে পথ ভ্রষ্ট করতে না পারলেও, তাদের সন্তানদের বড় একটি অংশকে আমি জাহান্নামে নিয়েই ছাড়বো।

আদম এবং হাওয়ার জন্য জান্নাতে এ সময়টুকু ছিল পরীক্ষাকাল। পরীক্ষার সময় শেষ হওয়ার পর আল্লাহ তার পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আদম এবং হাওয়াকে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, *"হে আদম ও হাওয়া এখন পৃথিবীতে চলে যাও। সেখানে সুখে শান্তিতে বসবাস করো। আজ থেকে তোমরা দুনিয়াতে তোমাদের খাদ্যের অনুসন্ধান করবে। পরিশ্রম করে খাদ্য যোগাড় করবে এবং এমন সকল কাজ করবে যা তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করে। এখন থেকে তোমাদের সন্তান-সন্ততি হবে। তোমাদের কাজ হল আমার আনুগত্য করা। আমার নির্দেশ মতো জীবন পরিচালনা করা। আর স্মরণ রাখবে, তোমাদেরকে সর্বদা শয়তানের চক্রান্ত থেকে দূরে থাকতে হবে। শয়তান সর্বদাই তোমাদেরকে ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করতে চাইবে। তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের বিপথগামী করে জাহান্নামে নিয়ে যেতে চাইবে।"*

আদম এবং হাওয়া এখন পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা। তারা এখন জান্নাত থেকে অনেক দূরে। অবশ্য তারা শিখেছেন যে কিভাবে আল্লাহর নিয়ামতের কদর করতে হয়। কিভাবে আল্লাহর নিয়ামত উপভোগ করে তার প্রশংসা করতে হয়। আদম এবং হাওয়া বহুবছর দুনিয়াতে অবস্থান করেছিলেন। তারা অনেক সন্তান-সন্ততিও পেয়েছিলেন। তাদের সন্তানরাও পেয়েছিল অনেক সন্তান সন্ততি। বর্তমান বিশ্বে আমরা যত মানুষ দেখছি তারা সকলেই আদমের সন্তান। পৃথিবীতে কত বর্ণের মানুষের বাস। কত বিচিত্র মানুষের মুখের ভাষা। মানুষের মধ্যে স্থান ও কালের ভিন্নতার কারণে কত পার্থক্য। কিন্তু সকলের এক সাধারণ পরিচয়। সকলেই আদম ও হওয়ার সন্তান।

এই গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্ন লিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক ও অভিভাবক শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন

- মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করা হয়েছিল
- মানুষই কেবল সৃষ্টির প্রকৃত নিগুর রহস্য উদ্ভাবন করতে ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারে
- আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে তার খলিফা করে পাঠিয়েছেন, যাতে তারা পৃথিবীর উপর নেতৃত্ব দিতে পারে
- মানুষকে কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে
- আমাদের আত্মা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ
- আল্লাহ মানুষকে এমন সব গুণাবলি দিয়েছেন যা তিনি ফেরেশতাদেরকেও দেননি
- মানুষ তাকে দেয়া স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি ব্যবহার করে আল্লাহর আনুগত্য করে তাহলে তারা হবে পুরস্কৃত
- পক্ষান্তরে মানুষ যদি স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি ব্যবহার করে আল্লাহর অবাধ্য হয় তবে তারা হবে শাস্তি প্রাপ্ত
- মানুষ আল্লাহর আনুগত্য করে আল্লাহরকে ভালোবেসে কিন্তু ফেরেশতারা আল্লাহর আনুগত্য করে বাধ্য হয়ে
- আল্লাহর প্রতি মানুষের আনুগত্য ফেরেশতার অনুগত্যের চেয়ে অনেক মূল্যবান, আর এজন্যই মানুষ পুরস্কৃত হবে
- মানুষ সকল সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত
- আল্লাহর ইবাদতকারী শয়তান নিজের প্রতি ভালোবাসাকে আল্লাহর আনুগত্য ও ভালবাসার উপর প্রাধান্য দিয়েছিল
- শয়তান যা করেছিল তার জন্য সে অহংকারী হয়ে বসেছিল
- আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন যে অহংকার করে, এমনকি কেউ তার ভালো কাজের জন্য অহংকার করলেও
- হিংসা এবং অহংকার মানুষকে অন্ধ করে তোলে, তখন মানুষ আর সত্য দেখতে পায় না
- হিংসা মন্দ কাজের দিকে ধাবিত করে
- মানুষকে তার গুণাবলি দ্বারাই বিবেচনা করতে হবে, তার রং রূপ দিয়ে নয়
- আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেন যারা অহংকারী ও আল্লাহর অবাধ্য

অনুশীলনী ৩২

ক. সঠিক উত্তরটি বৃত্ত দ্বারা আবৃত্ত কর।

১. আল্লাহ **মানুষ / ফেরেশতা** কে পৃথিবীতে তার খলিফা করলেন।

২. খলিফার কাজ হল **আল্লাহর / নিজের** জন্য তার নির্দেশ মত কাজ করা।

৩. আল্লাহ **মানুষ / ফেরেশতা** কে তার নিজের বিশেষ কিছু গুণাবলি দিলেন।

৪. **আদম / শয়তান** নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যের ভালোবাসার চাইতে বেশি ভালোবাসে।

৫. আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন যে **অহংকারী / বিনয়ী**।

৬. আদম **ইচ্ছাকৃত গুনাহ করলেন / ভুল করে** ফেললেন।

৭. আল্লাহ আদম ও হাওয়া আ. কে **শাস্তি দিলেন / ক্ষমা করে দিলেন**।

সিরাতুন নবী
(নবী মুহাম্মদ সা. এর জীবন চরিত)

নবী মুহাম্মদ সা.ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বশেষ নবী। তার প্রতি নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানি কিতাব কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তার নিজের এবং মানবজাতির মধ্যে যোগাযোগের চূড়ান্ত রূপরেখা দিয়েছেন। কেয়ামতের আগ পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে তাদের সকলের জন্য চূড়ান্ত নির্দেশনা এবং আলোকবর্তিকা রয়েছে কোরআন এবং নবী মুহাম্মদ সা.ল্লাল্লাহু সালামের জীবনীতে।

নবী মুহাম্মদ সা.ল্লাল্লাহু সাল্লাম মানবতার জন্য বিশেষ রহমত এবং কেয়ামতের আগ পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য বস্তুগত ও আধ্যাত্বিক জগতের পথপ্রদর্শক। তার কাছে আগত আসমানী নির্দেশনা হচ্ছে অতীতে আগত সকল আসমানী নির্দেশনার চূড়ান্ত ও পূর্ণতা দানকারী রূপ। মুহাম্মদ সা. আনীত বিধান হলো ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান। তার আনীত শিক্ষা বিভিন্ন গোত্র, বর্ণ ও আঞ্চলিকতার ভেদাভেদকে দূর করে বিশ্বমানবতাকে একই স্রষ্টার বান্দা হিসেবে দুনিয়াবী উন্নতি ও পরলৌকিক মুক্তির পথ নির্দেশনা দিচ্ছে এবং দিবে।

নবী মুহাম্মদ সা.ল্লাম ছিলেন এমন একজন নবী যিনি তার জীবদ্দশায় তার উপর অর্পিত আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে আঞ্জাম দিয়ে মানবতাকে সত্য সুন্দর জীবন উপহার দিয়েছিলেন। তার দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের আগেই কোরআন ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে আখ্যায়িত করেছে যা তার দ্বারা আরব সমাজে বাস্তবায়িত হয়েছিল। [কোরআন ৫:৩ এবং ১০:৯]

যখন নবী মুহাম্মদ সা. দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন তখন ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার জীবদ্দশায় মুসলিম জাতি দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত একটি খ্যাতিমান সফল জাতির মর্যাদা লাভ করেছিল। কোরআন তার জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়েছিল এবং কোরআনের আদ্যোপান্ত তিনি দেখে পড়ে তার নির্ভরযোগ্যতা নিজেই ঘোষণা করে গিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে ইসলাম নামক দিনটি কে আল্লাহ নবী মুহাম্মদ সা.ল্লাম এর মাধ্যমেই পরিপূর্ণতা দিয়েছেন। সুতরাং নবী মুহাম্মদ সা. এর জীবন (বিশেষত নবুয়তী জীবন) ইসলামেরই বাস্তব রূপ।

নবী মুহাম্মদ সা. মানবতার জন্য যে উত্তম জীবন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা না অতীতের কোন নবী দ্বারা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর না ভবিষ্যতে কারো পক্ষে এমনটি করা সম্ভব হবে। নবী মুহাম্মদ সা. না ছিলেন কোন নির্দিষ্ট জাতি গোষ্ঠীর নেতা আর না ছিলেন কোনো নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ের বন্ধনে সীমাবদ্ধ কোন মহা মানব। বরং তিনি ছিলেন সকল গোত্র, জাতি-ধর্ম ও আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে সর্ব কালের সেরা পথ প্রদর্শক ও যোগশ্রেষ্ট নেতা।

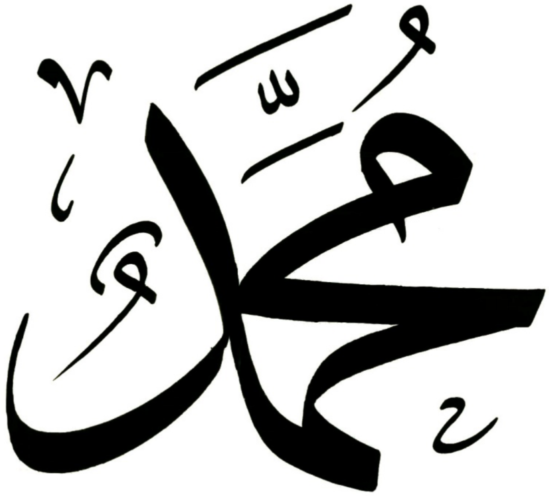

পাঠ ১

নবী মুহাম্মদ সা. ও তার জন্ম

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে পারবে,

- *ইসলামপূর্ব আরবদের পরিচয় ও জীবন আচার*
- *মূর্তি পূজার ফলে সমাজে কি ধরনের অন্যায় ও অবিচার ছড়িয়ে পড়ে*
- *আল্লাহ মানুষের সংশোধন এবং মঙ্গল প্রত্যাশী*
- *আল্লাহ কেন নবী এবং রাসূল প্রেরণ করেন*
- *নবী এবং রাসূল পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য*
- *শিশুর শারীরিক, মানসিক এবং ভাষাগত উৎকর্ষতার জন্য ভালো পরিবেশের প্রয়োজন*
- *কারো প্রতি দয়া প্রদর্শন ও সহানুভূতি দেখানোর পুরস্কার ইহজগতেও পাওয়া যায়*
- *সত্যবাদিতা ও সৎ চরিত্রতা একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় গুণাবলি*

নবী মুহাম্মদ সা. ও তার জন্ম

মরুভূমির দেশ আরব। আরবের লোকেরা মরুভূমির মধ্যেই জীবন যাপন করতো। তারা ছিল মূর্তি পূজারী। নিজ হাতে মূর্তি তৈরি করে তারই উপাসনা করতো।

আরবের লোকেরা ছিল খুবই অসভ্য। তারা দরিদ্র, দুর্বল এবং এতিমদের প্রতি ছিল অত্যন্ত নির্দয় ও কঠোর। সেই আরব দেশেই জন্ম হলো এক নবীর। নাম তার মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। মুহাম্মদ সা.ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সময়টি ছিল ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের রবিউল আউয়াল মাস।

তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ তাঁর জন্মের আগেই মারা যান। তাঁর মায়ের নাম ছিল আমিনা। আর তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন আরবদের সর্দার।

মক্কার লোকেরা শিশু জন্মের পর প্রতিপালনের জন্য গ্রামে পাঠিয়ে দিত। তারা মনে করত, গ্রামের পরিবেশ শিশুদের উন্নত ভাষা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো।

মুহাম্মদ সা.ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধাত্রী হালিমার কোলে গ্রামের পরিবেশে বড় হতে লাগলেন। শিশুকাল থেকেই তাঁর আচার-ব্যবহার এবং চরিত্র ছিল অত্যন্ত উন্নত ও প্রশংসিত।

অনুশীলনী ৩৩

ক. নিচের ঘরে রক্ষিত উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

আব্দুল্লাহ স্বাস্থ্যের উপাসনা প্রশংসিত হালিমার গ্রামে মক্কা সর্দার নির্দয়

১. আরবের লোকেরা নিজ হাতে মূর্তি তৈরি করে তারই ------------ করতো।

২. আরবরা দরিদ্র, দুর্বল এবং এতিমদের প্রতি ছিল অত্যন্ত -----------ও কঠোর।

৩. নবী মুহাম্মদ সা. আরবের --------- নগরে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

৪. তাঁর পিতা ----------- তাঁর জন্মের আগেই মারা যান।

৫. আর তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন আরবদের ----------------।

৬. মক্কার লোকেরা শিশু জন্মের পর প্রতিপালনের জন্য ----------- পাঠিয়ে দিত।

৭. গ্রামের পরিবেশ শিশুদের উন্নত ভাষা শিক্ষা এবং ---------- জন্য খুবই ভালো।

৮. মুহাম্মদ সা. ধাত্রী --------- কোলে গ্রামের পরিবেশে বড় হতে লাগলেন।

৯. শিশুকাল থেকেই তাঁর আচার-ব্যবহার এবং চরিত্র ছিল অত্যন্ত উন্নত ও ---
-------------।

নবী মুহাম্মদ সা. এর জন্ম ও শৈশব

পর্ব ১: আরবদের শেকড়

অনেক অনেক আগের কথা। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আরবের মরুভূমি ছিল প্রচন্ড গরম। প্রচন্ড সূর্য তাপ আর উষ্ণতা মমরুভূমিকে বসবাসের প্রায় অনুপযোগী করেছিল। কোথাও কোথাও শত শত মাইলের মধ্যে কোন গাছপালা দেখা যেত না। সর্বত্রই শুধু বালি, পাথর আর উঁচু উঁচু পাহাড়। জীবনযাত্রা সেখানে বড়ই কঠিন ছিল। তবে কোথাও কোন জলাশয় বা পানির সন্ধান পাওয়া গেলে লোকেরা সেখানেই বসবাস করতে ভিড় জমাত।

আরব দেশে পশু ছিল খুব সীমিত। মরুভূমিতে উটের বিচরণ অবশ্য চোখে পড়ার মতো ছিল। এর কারণও আছে। উঠ এমন একটি প্রাণী যে পানি ছাড়াই দিনের পর দিন বেঁচে থাকতে পারে। প্রচন্ড গরমেও শত শত মাইল পথ পাড়ি দিতে পারে।

এই মরুর বুকে বাস করতো একটি সাহসী জাতি। তারা ছিল খুবই অতিথি-পরায়ন। তারা স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পছন্দ করত। তারা ছিল খুবই কষ্ট সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। পশুপালন ছিল তাদের জীবিকার প্রধান উৎস। এত গরম ও উত্তাপ এর মধ্যে তারা উঠে চড়ে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ঘুরে বেড়াত। যেখানেই রাত হতো সেখানেই চাঁদের আলোতে মরুভূমিতে ঘুমিয়ে পড়তো। আর জান, সেই আরবরা কার বংশধর? তারা ছিল নবী ইব্রাহিম আ. এর বংশধর। নবী ইব্রাহিম আ. ছিলেন 'খলিলুল্লাহ' মানে আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার বংশধররাই আজ আরব নামে পরিচিত।

দুর্ভাগ্য আরব সমাজের। তারা তাদের নবীর দেয়া শিক্ষা একদম ভুলে গিয়েছিল। ইব্রাহিম আ. তাদেরকে এক আল্লাহর বন্দেগী করতে বলেছিলেন। এই শিক্ষার

প্রতি তারা অবহেলা দেখিয়ে বিভ্রান্তির পথে চলে গেল। তারা এক আল্লাহ কে বাদ দিয়ে অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা করতে শুরু করল। তাদের ভুল সংশোধন করার মত কোন লোক তখন ছিল না। কে তাদেরকে এক আল্লাহর দিকে ডাকবে? কে বলবে মূর্তি পূজা করা উচিত নয় ? এমন কোন লোক তখন আরব দেশে ছিল না।

তাদের একটি বদ অভ্যাস ছিল তারা মদ পান করতো ও নেশা গ্রস্থ হতো। আল্লাহর দ্বীনের শিক্ষা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাওয়ায় তারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছিল। মহিলা এবং শিশুদের প্রতি তারা ছিল খুবই নিষ্ঠুর। কোন কোন মন্দ লোক নিজ কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দিত। মেয়েরা তাদের জন্য বোঝা হতে পারে ভেবে তারা এই নিষ্ঠুরতা দেখাতো। নিষ্ঠুর পিতা ফুটফুটে মেয়েকে মাটি চাপা দিয়ে আসতো। মরুভূমির বালির প্রচন্ড উত্থাপ তাকে অল্প সময়ে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিত আর সে পোকামাকড়ের খাদ্যে পরিণত হতো। আর যারা ছিল বিধবা কিংবা এতিম তাদেরকে সহযোগিতা করার কেউ ছিল না। উল্টো তাদের কিছু সহায় সম্পদ থাকলে প্রভাবশালীরা তা দখল করে নিতে।

আরবদের কিছু ভালো গুণাবলি থাকলেও তারা অত্যন্ত মন্দ জাতিতে পরিণত হয়েছিল। তারা অসভ্য জীবন যাপন করত। তাদেরকে সভ্যতা ও ভদ্রতা শিখাবে এমন কোন শিক্ষক তাদের মাঝে ছিল না।

পর্ব ২: অন্ধকারে আলোর ঝলক

আল্লাহ সকল জাতির কাছে একজন পথ প্রদর্শক পাঠান। তাই আল্লাহ পথভ্রষ্ট আরব জাতীর পথ দেখানোর ব্যবস্থা করলেন। মক্কা ছিল আরবের কেন্দ্র। তাই আল্লাহ মক্কাকেই পছন্দ করলেন একজন নবী পাঠানোর জন্য। যিনি তাদেরকে দেখাবেন সত্য পথ। এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করবেন। মক্কার কুরাইশ বংশে

জন্ম হলো এক মহান শিশুর। বিশ্ববাসী যেন এমনই একটি শুভ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিল। তার জন্মে সকল সৃষ্টি আনন্দের পুলক অনুভব করল।

শিশুটির দাদা ছিলেন আব্দুল মুত্তালিব, মক্কায় অবস্থিত কাবা ঘরের মুতাওয়াল্লী। তিনি অনেক চিন্তাভাবনা করে শিশুটির নাম রাখলেন মুহাম্মদ। আর জানো মুহাম্মদ শব্দের অর্থ কি? এর অর্থ হলো 'প্রশংসিত'। আর হ্যাঁ সেই শিশুটির প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ করেছেন। আর দুনিয়াবাসী আজও তার প্রশংসায় মুখরিত।

শিশু মুহাম্মদের জন্মের আগেই তার পিতা মারা গিয়েছিলেন, যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ। আহ তিনি বেঁচে থাকলে শিশুটি দেখে খুবই আনন্দ পেতেন। কিন্তু তার সেই সৌভাগ্য হলো না। আর শিশু মুহাম্মদ ও জানেন না তার যে পিতা নেই। শিশুটির মা আমিনা শিশুটিকে নিয়ে আগ থেকেই অনেক ভালো ভালো স্বপ্ন দেখতেন। তার জন্মের মাধ্যমে মায়ের স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছিল।

পর্ব ৩: ধাত্রী হালিমার কোলে

সেকালে আরবদের নিয়ম ছিল জন্মের পর নারীরা তাদের শিশুদেরকে মরুময় গ্রামের ধাত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিত। সেখানে তারা নির্মল আলো বাতাস আর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেড়ে উঠতো। আর সেই গ্রামবাসীদের বিশুদ্ধ আরবি কথন থেকে বিশুদ্ধ আরবি শিখতে পারতো। গ্রামে পাঠানোর আরও একটি কারণ ছিল। শহর গুলোতে বিভিন্ন দেশের লোকেরা যাতায়াত করত। যাদের মাধ্যমে সেখানে অনেক রোগ জীবাণু ছড়িয়ে পড়তো। কিন্তু গ্রামের উষ্ণ পরিবেশ জীবাণুমুক্ত ছিল। শিশুরা সেখানে বিশুদ্ধ মাতৃভাষা শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর পরিবেশে দ্রুত বেড়ে উঠত।

প্রতি বৎসরের ন্যায় বনু সা'দ গোত্রের গ্রামীণ মহিলাদের একটি দল মক্কায় এলো শিশু সংগ্রহ করতে। শিশুদের গ্রামীণ পরিবেশে নিয়ে লালন পালন করবে আর

বিনিময়ে তারা কিছু টাকা করি পাবে। আমিনা ছিলেন অত্যন্ত গরিব। তার স্বামী বেঁচে নেই। তাই তার শিশুটিকে লালন পালন করলে উপযুক্ত পারিশ্রমিক সে দিতে পারবে না। তাই কোন মহিলা এই সন্তানটিকে নিতে চাইল না।

সেই কাফেলায় একজন দরিদ্র মহিলা ছিল, যার নাম ছিল হালিমা। অনেক খোঁজাখোঁজ ি করে সে কোন শিশু পেল না। তাকে শিশু ছাড়াই খালি হাতে ফিরে যেতে হবে, তা কেমন করে হয়? তাই কোন উপায় না পেয়ে সে শিশু মুহাম্মদকেই নিয়ে যেতে চাইল। তার নিজেরও শিশু মুহাম্মদ এর সমবয়েসী একটি সন্তান ছিল। সে চিন্তা করলো দুই শিশুই একসাথে বেড়ে উঠবে, তারা একে অন্যের প্রতি বন্ধু হয়ে থাকবে, খেলাধুলা করবে ও সুন্দর সময় কাটাবে।

হালিমা যখন শিশু মুহাম্মদকে নিয়ে ঘরে ফিরলেন, তার মন খুশিতে ভরে উঠলো। তার পশুগুলো এখন অনেক দুধ দিচ্ছে যা পূর্বে সে কখনো পেত না। আর তার ক্ষেতের ফসল গুলো যেন আগের চেয়ে এখন অনেক দ্রুত বেড়ে উঠছে আর আশাতীত ফলন দিচ্ছে। হালিমা বুঝতে পারলেন, এতিম ও দরিদ্র শিশুটিকে গ্রহণ করাতেই তার সংসারে বরকত চলে এসেছে। দুঃখের সংসারে যেন এখন সুখের আনন্দ বয়ে যাচ্ছে। হালিমার সুখের দিনগুলো যেন দ্রুতই চলে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে মাস ও বছর চলে যাচ্ছে। এভাবেই চার বৎসর দ্রুত পার হয়ে গেল। মুহাম্মদ এখন চার বছরের সুঠামদেহি শিশু। তার মুখের ভাষা খুবই বিশুদ্ধ ও চমৎকার। হালিমা শিশুটিকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে মক্কায় চলে এলেন।

মা আমিনার আনন্দ কে দেখে? শিশুটির বিশুদ্ধ আরবি কথন শুনে আমিনা অত্যন্ত আনন্দিত। আর শিশু মুহাম্মদের সুঠাম দেহ ও সুন্দর চেহারা তার মনে আনন্দের ফোয়ারা বইয়ে দিল। তিনি আদর করে শিশুটির মুখে চুমুখান ও বুকে জড়িয়ে নেন। মা ও শিশু এখন একত্রে সময় কাটাবেন কি আনন্দ ও মজা, তাই না?

এই গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্ন লিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক ও অভিভাবক শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন

- আরবরা জাতিগতভাবে অত্যন্ত সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু ও অতিথি পরায়ণ। মরুভূমির কষ্টকর জীবন তাদেরকে মেহমানদের কষ্ট বুঝতে সহায়তা করেছে। তাই তারা অতিথি পরায়ণ হয়েছে
- আরবরা নবী ইব্রাহিম আ. এর বংশধর। নবী ইব্রাহিম আ. এর সন্তান ইসমাইল থেকে তাদের বংশের সূচনা
- অন্যান্য জাতির মত আরবরাও মূলত এক আল্লাহর বন্দেগী করত। নতুন প্রজন্মকে সঠিক শিক্ষা দান না করার ফলে তারাই এক সময় মূর্তি পূজারী হয়ে গেল
- যারা মিথ্যা খোদার উপাসনা করে তারা নিষ্ঠুর হয়। তারা মদ পান, জুয়া খেলা এবং হত্যায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে
- মিথ্যা খোদার উপাসনাকারীগণ নারী এবং শিশুদেরকে সম্মান দেখাতে পারেনা
- মুর্তুপূজারীগণ দরিদ্র, দুর্বল, ইয়াতিম এবং বিধবাদের প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে থাকে
- মানুষ তখনই বিপথগামী হয় যখন তাদের কাছে সঠিক পথ নির্দেশনা থাকে না
- সঠিক নির্দেশনার অভাবে অনেক ভালো গুণাবলিও মন্দ কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে। আরবদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে
- আল্লাহ কোন জাতিকেই পথ নির্দেশনা এবং শিক্ষকহীন অবস্থায় ছেড়ে দেন না
- শিশুদের জন্য অর্থপূর্ণ উত্তম নাম রাখা পিতামাতা ও অভিবাবকদের উচিত
- শিশুরা অবশ্যই স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেড়ে উঠবে। এটা তাদের জন্মগত অধিকার
- সুন্দর ভাষা ও স্পষ্টবাদিতা মানুষকে পশু থেকে পৃথক করে ও সম্মানিত করে
- শিশুদেরকে বাল্যকাল থেকেই মানসিক এবং শারীরিকভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করা উচিত। দূর দূরান্তে ঘুরে বেড়ানোর মাধ্যমে তা অর্জিত হয়
- ভালো কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সব সময় শুধু আর্থিক সুবিধার দিকে নজর দেয়া উচিত নয়
- আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতে ও পুরস্কৃত করেন যারা অন্যের উপকার করে এবং মানুষের প্রতি দয়া দেখায়
- আল্লাহ তাদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেন যারা অন্যদের সুখ-সাচ্ছন্দের জন্য চেষ্টা করে
- আমাদের কখনোই খাওয়া-দাওয়া এবং শিশুদের ভরণপোষণ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়
- রিজিকের মালিক মূলত আল্লাহ। তিনি কোথা থেকে এই ব্যবস্থা করে দেবেন তা তিনিই ভাল জানেন
- শিশুদের মূল সৌন্দর্য হচ্ছে তাদের আচার ব্যবহার এবং চারিত্রিক সৌন্দর্য
- শিশু এবং মায়ের মধ্যকার ভালোবাসা অমূল্য রত্ন যা দুনিয়ার আর কোথাও পাওয়া যায় না

অনুশীলনী ৩৪

ক. তুমি কি জানো, নিচের শব্দটি কি? শব্দটি রং কর এবং নির্দেশিত স্থানে এর বিবরণ দাও:

محمد

জন্ম স্থান:

পিতা:

মাতা:

দাদা:

ধাত্রীমা:

পাঠ ২

নবী মুহাম্মদ সা. এর যৌবনকাল

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে পারবে,

- *এতিমের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার নিকট আত্মীয়দের উপর বর্তায়*
- *শিশুদের লালন-পালনের বিষয়টি অন্য যে কোন কাজের চাইতে অগ্রাধিকার পাবে*
- *স্বল্প বয়সে প্রিয়জনদের হারানোর ব্যাথা একজন নবীকে মানুষের দুঃখ বেদনা বুঝতে সহায়তা করে*
- *অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে খ্রিস্টানরা প্রকৃত সত্যকে স্বীকার করে ও সহজে ইসলাম গ্রহণ করে*
- *নবীরা আল্লাহর পক্ষ হতে মুজেজা প্রাপ্ত হন, যা সত্য সন্ধানীদেরকে সত্য গ্রহণে সহায়তা করে*
- *নবীরা শিশুকাল থেকেই মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে থাকেন*
- *ইহুদিরা সবসময়ই নবীদের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে*

নবী মুহাম্মদ সা. এর যৌবনকাল

নবী মুহাম্মদ সা. প্রিয় মা আমেনার সাথে মাত্র দুই বছর অবস্থান করলেন। যখন মুহাম্মদ সা. এর বয়স ছয় বৎসর হল, মা আমেনা তাকে নিয়ে মদিনায় বেড়াতে গেলেন। আমেনার পরিবার পরিজন মদিনায় বসবাস করতেন।

মদিনা থেকে ফিরে আসার পথে মা আমিনা মৃত্যুবরণ করলেন। অসহায় শিশু মুহাম্মদ আমেনার সফর সঙ্গী দাসীর সাথে মক্কায় চলে এলেন। মুহাম্মদ সা. এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

কিন্তু দুই বছর যেতে না যেতেই আব্দুল মুত্তালিবও মারা গেলেন, যখন নবী মুহাম্মদ সা মাত্র ৮ বছরের শিশু। এরপর নবী মুহাম্মদ সা. এর চাচা আবু তালেব তার দেখাশোনা এবং ভরণপোষণের দায়িত্ব নিলেন। আবু তালেব আপন ভাতিজা নবী মুহাম্মদ সা. কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

১২ বছর বয়সে আবু তালেব মুহাম্মদ সা. কে নিয়ে ব্যবসায়িক কাজে সিরিয়া গেলেন। যাত্রাপথে তারা বাহিরা নামক এক খ্রিষ্টান পাদ্রির সাথে সাক্ষাৎ করলেন। পাদ্রী বাহিরা মুহাম্মদ সা. কে সর্বশেষ নবী হবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

অনুশীলনী ৩৫

ক. সত্য-মিথ্যা নির্ণয়। যথাযথ ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

<u>সত্য</u> <u>মিথ্যা</u>

☐ ☐ নবী মুহাম্মদ সা. তার মা আমেনার সাথে মাত্র চার বছর অবস্থান করলেন।

☐ ☐ ছয় বৎসর বয়সে মা আমেনা মুহাম্মদ সা. কে নিয়ে মদিনায় বেড়াতে গেলেন।

☐ ☐ মদিনায় যাওয়ার পথে মা আমিনা মৃত্যুবরণ করলেন।

☐ ☐ অসহায় শিশু মুহাম্মদ দাসী উম্মে আইমানের সাথে মক্কায় চলে এলেন।

☐ ☐ আব্দুল মুত্তালিবও মারা গেলেন, যখন নবী মুহাম্মদ সা মাত্র ৭ বছরের শিশু।

☐ ☐ আবু তালেব নবী মুহাম্মদ সা. কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

☐ ☐ ১২ বছর বয়সে আবু তালেব মুহাম্মদ সা. কে নিয়ে সিরিয়া গেলেন।

☐ ☐ পাদ্রী বাহিরা মুহাম্মদ সা. কে সর্বশেষ নবী হিসেবে ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

মুহাম্মদ সা. : দুঃখ ও যৌবনের অভিজ্ঞতা
পর্ব ১: নানা বাড়িতে ইয়াসরিবে

ধাত্রীর কোলে চার বছর কাঠিয়ে মুহাম্মদ সা. মা আমিনার কাছে ফিরে এলেন। এটা ছিল আমেনা এবং তার শিশুর জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আনন্দ ও হাসি খুশির মধ্যে দিয়েই তাদের দিন যাচ্ছিল। এরপর যখন মুহাম্মদ সা. এর বয়স ৬ বছর, তার মা আমেনার ইচ্ছা হল তার পিতা মাতার স্থান ইয়াসরিবে (মদিনায়) বেড়াতে যাবেন। মুহাম্মদ সা. ও অত্যন্ত খুশি, তিনি যাচ্ছেন নানা বাড়িতে। কিন্তু এ যাত্রা পথ সহজ ছিল না। সফর সঙ্গী হিসেবে আমেনা তার দাসী উম্মে আইমানকে সাথে নিলেন। অনেক কষ্টে তারা মদিনায় পৌঁছলেন।

মদিনায় যাওয়ার পর আত্মীয় স্বজনরা তাদের কে অত্যন্ত আদর যত্ন করলেন। এটা যে কত আনন্দের ছিল মা আমিনা এবং তার শিশু মুহাম্মদ সা. এর জন্য, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। ‘অনেকদিন পর আত্মীয় স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ ও আদর আপ্যায়ন’ এ আনন্দ ও খুশির কথা ভুলার নয়। মুহাম্মদ সা. এর মন চাইলো সেখানে তিনি আজীবন থেকে যান। কিন্তু তা তো সম্ভব ছিল না।

এ সুখের পর কঠিন এক দুঃখ চলে আসলো তার জীবনে। যে দুঃখে মুহাম্মদ সা. এর অন্তর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। কি ছিল সেই দুঃখের বিষয়টি? মা আমিনা মদিনা থেকে বিদায় নিলেন মক্কার পথে। অনেক কষ্টে পথ পাড়ি দিচ্ছেন। পথিমধ্যে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এটাই ছিল তার জীবনের সর্বশেষ অসুস্থতা। আমেনা মারা গেলেন। মুহাম্মদ সা. এখন সম্পূর্ণ অসহায় পিতৃ-মাতৃহীন এতিম বালক। দাসী উম্মে আইমান মুহাম্মদ সা. কে নিয়ে বহুকষ্টে মক্কায় এসে পৌঁছলেন।

পর্ব ২: চাচা আবু তালিবের আশ্রয়ে

আমিনার মৃত্যু সংবাদে আব্দুল মুত্তালিব খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। আব্দুল মুত্তালিব শিশু মুহাম্মদ সা. এর যাবতীয় দায়ভার গ্রহণ করলেন। তিনি ছিলেন মক্কার সরদার ও কাবার মুতাওয়াল্লী। তার প্রভাব ছিল আরবের সর্বত্র। তিনি সেই আব্দুল মুত্তালিব যিনি আদর করে তার নাম রেখেছিলেন মুহাম্মদ। আব্দুল মুত্তালিব অত্যন্ত সাহসী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু একটি কাজে তিনি ছিলেন খুবই দুর্বল আর তা হল মুহাম্মাদ সা এর প্রতি তার অগাদ ভালোবাসা।

আব্দুল মুত্তালিবের আদর, যত্ন ও উৎসাহ উদ্দীপনায় মুহাম্মদ সা. তার অতীতের সকল দুঃখ ভুলে গেলেন। দাদা আব্দুল মুত্তালিব আপন সন্তানের চেয়েও তার নাতিকে ভালোবাসতেন। ভালোই যাচ্ছিল তার দিন, মাস ও বছর। দাদার স্নেহভরা সময়টুকু ছিল তার জীবনের এক রঙিন স্মৃতি, যা কখনও ভুলার নয়। কিন্তু আবারো এক ঘন অন্ধকার নেমে এল তার জীবনে। কোন এক অন্ধকার রাতে আবদুল মুত্তালিব অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ অসুস্থতায়ই মারা গেলেন মক্কার সরদার ও আরবদের নেতা। দাদার মৃত্যু মুহাম্মদ সা. এর জন্য ছিল খুবই কষ্টের।

মুহাম্মদ সা. এর চাচা আবু তালেব এখনো বেঁচে আছেন। এবার আবু তালিব তার সব দায় দায়িত্ব নিলেন। তিনি তাকে নিজ ঘরে নিয়ে গেলেন। আপন সন্তানের মতই লালন-পালন ও ভরণ পোষণ করতে থাকলেন। তিনি মুহাম্মদ সা. কে এতই ভালোবাসতেন যে, লোকেরা তাকে আবু তালেব এর সন্তান বলেই মনে করতো। মুহাম্মদ সা. কে কোথাও খোঁজে পাওয়া না গেলে, তাকে অবশ্যই পাওয়া যাবে আবু তালেবের পাশে।

কেন তিনি তাকে ভালবাসবেন না? তিনি ছিলেন এমন এক বালক যে অন্যান্য যেকোনো বালকের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি দেখতে ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর

ও সুস্বাস্থের অধিকারী। তার আচার ব্যবহার ছিল উন্নত। তার বুদ্ধিমত্তা ও সততা সকলকেই মুগ্ধ করত। তার চরিত্রের সাথে অন্য কোন বালকের তুলনা হয় না। তিনি সকলের কাছে অত্যন্ত সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত বালক হয়ে উঠলেন।

সেই সময়ে তিনি মক্কার অলিতে-গলিতে যখন হাঁটতেন লোকেরা দূর থেকে তাকে দেখিয়ে বলতো সত্যবাদী বালকটি যাচ্ছে, বিশ্বস্ত ছেলেটি যাচ্ছে। যথার্থ কারণেই আবু তালেব তার ভাতিজাকে নিয়ে অত্যন্ত গর্ববোধ করতেন। আবু তালিব যেথায়ই যেতেন ভাতিজাকে সাথে নিয়ে যেতেন। আবু তালেব নিজ সন্তানের মতই তার দ্বারা নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতেন।

পর্ব ৩: পাদ্রী বাহিরার গির্জায়

এবার মুহাম্মদে সা এর জীবনে এক চমৎকার সুযোগ এলো, যা অতীতে কখনো তার জীবনে ঘটেনি। সেই সময়ে প্রসিদ্ধ এক পাদ্রীর গির্জা ছিল বোসরা অঞ্চলে। মক্কা থেকে ব্যবসায়িক কাফেলা সিরিয়ায় যাতায়াত করত যে পথ দিয়ে গির্জাটি ছিল সে পথের পাশে। পাদ্রীর নাম হলো বাহিরা। এই ব্যক্তি আল্লাহর উপাসনায় তার জীবন কাটিয়ে দিয়েছিল। অতীতের সকল আসমানী কিতাবের জ্ঞান ছিল তার কাছে। মুসা আ. এর প্রতি নাযিলকৃত তাওরাত ও ঈসা আ. এর প্রতি নাযিলকৃত ইঞ্জিললের উপর তার ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। সেই কিতাবগুলো থেকে তিনি জানতে পেরেছিলেন, অচিরেই একজন নবীর আগমন ঘটবে। ইনি হবেন সর্বশেষ নবী। বাহিরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যেন সেই নবীকে তিনি দেখে যেতে পারেন।

মক্কার লোকেরা ছিল পেশায় ব্যবসায়ী। দূরদূরান্তে ব্যবসা-বাণিজ্য করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। উট বুঝাই করে মালামাল নিয়ে মাসের পর মাস যাত্রা করে তারা ইয়ামান ও সিরিয়া সহ বহু দূরদেশে ভ্রমণ করতো। এসব বিক্রি করে নিত্য নতুন মালামাল নিয়ে মক্কায় ফিরে আসতো। আবু তালেব ব্যবসায়িক

কাফেলা নিয়ে সিরিয়ায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আবু তালেব সিদ্ধান্ত নিলেন, ভাতিজা মুহাম্মদ সা. কে এ যাত্রায় সাথে নিবেন। উদ্দেশ্য, তাকে ব্যবসা বাণিজ্যের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কলা কৌশল শিক্ষা দেয়া।

মুহাম্মদ তখন ১২ বছরের এক উৎসাহী বালক। প্রথম বারের মত দূরদেশে চাচার সফরসঙ্গী হতে পারবেন জেনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। তার আনন্দ আর কে দেখে? নতুন জায়গা দেখবেন, নতুন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হবে আর সাথে অর্জিত হবে ব্যবসার অভিজ্ঞতা। সবকিছু প্রস্তুত করে কাফেলা যাত্রা শুরু করলো। দীর্ঘ মরুপথ পাড়ি দিয়ে কাফেলা গিয়ে পৌঁছল বসরায়। কাছেই ছিল পাদ্রী বাহিরা'র গির্জা। বাহিরা অত্যন্ত মনযোগ দিয়ে গির্জায় বসে ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করছিলেন। হঠাৎ তিনি জানালা দিয়ে বাহিরের দিকে তাকালেন। তার নজরে এলো, দূর থেকে একটি ব্যবসায়িক কাফেলা এগিয়ে আসছে। এ ধরনের ব্যবসায়িক কাফেলা সচরাচর তিনি দেখে থাকেন। তবে এই কাফেলা তার কাছে একটু ব্যতিক্রমই মনে হল।

বাহিরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন, কাফেলা যেদিকেই যাচ্ছে একখণ্ড মেঘ তাদেরকে ছায়া দিয়ে যাচ্ছে। মেঘ খণ্ডটির চলার গতি কাফেলার গতির মতোই। তার মনে এলো, ভুল কিছু দেখছিনাতো? তিনি নিজে নিজে বললেন, এই মেঘমালা নিশ্চয়ই কাউকে ছায়া দিচ্ছে। প্রচন্ড সূর্য কিরণ থেকে কাউকে বাঁচিয়ে রাখছে। শেষ পর্যন্ত কাফেলাটি একটি গাছের নিচে এসে থামলো। সবাই যখন গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিল তখন মেঘখণ্ড উধাও হয়ে গেল। বাহিরা জানতেন, মেঘমালার এ ধরণের ছায়া দান নবী ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রে ঘটে না। তিনি আরো লক্ষ্য করেছিলেন, সকল গাছপালা ও পাথর কাফেলার কোন একজনকে সালাম জানাচ্ছে ও তার সম্মানে ঝুকে পড়ছে। বাহিরা মনে মনে চিৎকার করে উঠলেন। বাহিরা ব্যবসায়ী কাফেলাকে স্বাগত জানাতে গির্জা থেকে বেরিয়ে এলেন। সাধারণত তিনি গির্জা হতে বের হননা। এবার তার ব্যতিক্রম হলো।

তিনি কাফেলাকে গির্জার আতিথেয়তা গ্রহণ করতে আহবান জানালেন। এটা আবু তালেব এবং কাফেরার অন্যান্য সদস্যদের কাছে খুবই বিস্ময়কর ছিল। বাহিরা কাফেলা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন কিন্তু তিনি যে প্রশ্নের উত্তরটি জানতে চেয়েছিলেন তা তিনি পাচ্ছিলেন না। অবশেষে তিনি প্রশ্ন করেই বসলেন, *"আপনাদের সকলেই কি এখানে এসেছেন? নাকি কাউকে পিছনে রেখে এসেছেন? "না, সকলে এখানে আসে নাই, আবু তালেব উত্তর দিলেন।"* আমার ভাতিজাকে উটগুলো দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে বাকিরা সকলে এখানে। সে বয়সে বালক।

বাহিরা বললেন, *"তুমি কি আমাকে তার সাথে কথা বলার সুযোগ করে দেবে?"* আবু তালেব তাকে ডেকে নিয়ে আসলে বাহিরা মুহাম্মদ সা. এর খুব কাছাকাছি হয়ে তাকে প্রশ্ন করতে লাগলেন। তিনি তাকে একে একে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। একজন যুবক হিসেবে মুহাম্মদ বাহিরার সকল প্রশ্নের চমৎকার উত্তর দিলেন। উত্তর শুনে বাহিরার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। বাহিরা আবুতালেব কে বললেন, *"আমি নিশ্চিত মুহাম্মদই হবেন আখেরি জামানার নবী। আমি গাছপালা ও পাথরকে দেখেছি তাকে সম্মান জানাতে। আর তার কাঁধে আছে মহরে নবুয়াত (নবী হওয়ার চিহ্ন) যা আমি স্পষ্টতই চিনতে পেরেছি।"*

বাহিরা আবু তালেবকে বললেন, *"তাকে তুমি এখনই মক্কায় ফিরিয়ে দাও। আর তার ব্যাপারে যত্নবান থাকবে। কারণ সিরিয়ায় অনেক ইয়াহুদী আছে, তারা তাকে চিনতে পারলে তার ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করবে।"* আবু তালেব বিলম্ব না করে মুহাম্মদ সা. কে মক্কায় ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। সেইদিন থেকে আবু তালেব মুহাম্মদকে ছায়ার মত কাছে রাখতেন, যাতে তার কোনো ক্ষতি না হয়। আবু তালেব পাদ্রীর কথা রক্ষা করেছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত আবু তালেব মুহাম্মদ সা. এর কোন ক্ষতি হতে দেন নাই।

এই গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্ন লিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক ও অভিভাবক শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন

- আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে দেখতে যাওয়া পুণ্যের কাজ
- আত্মীয়-স্বজনের সাথে যাওয়া আসার মাধ্যমে ভালোবাসা ও সুসম্পর্ক বৃদ্ধি পায়
- পিতা মাতার মৃত্যু একজন শিশুর জন্য সবচেয়ে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা
- নিকট আত্মীয়ের দায়িত্ব হল এতিম শিশুর লালন পালন করা
- যে কোনো পেশার চাইতে, তা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, একজন শিশুর গুরুত্ব অনেক বেশি
- শিশুদের প্রতি যত্নশীলতা ও ভালোবাসা একজন মানুষের মহত্ত্বের পরিচয়
- প্রিয়জনদের বিচ্ছেদ ব্যক্তিকে জীবনের গুরুত্ব বুঝতে ও মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়
- নবী মুহাম্মদ সা. এর জীবনে আত্মীয় হারানোর বেদনাগুলো তাকে পরবর্তী জীবনে মানবতাকে এমনভাবে ভালবাসতে শিখিয়েছে যার কোন তুলনা হয় না
- উত্তম চরিত্র হচ্ছে মানুষকে মুগ্ধ করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম
- উত্তম চরিত্র সম্পন্ন মানুষের প্রতি সকলেই মনের অজান্তে ঝোঁকে পড়ে
- নবী মুহাম্মদ সা. এর আগমনের কথা পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল
- নবী মুহাম্মদ সা. এর সময়ে বহু খ্রিস্টান লোক তার আগমন সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল
- খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা বিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী তারা সহজে ইসলামকে চিনে এবং গ্রহণ করতে পারে
- বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে ভ্রমণ হচ্ছে একটি অন্যতম মাধ্যম
- সকল নবী এবং রাসূলকে আল্লাহ মুজেজা দ্বারা সাহায্য করেছিলেন
- মুজেজা ঈমান বৃদ্ধি করে এবং বিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তির হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক করে
- খ্রিস্টান পাদ্রীরা মানুষের সংসর্গ পরিত্যাগ করে চললেও, ইসলাম শিক্ষা দেয় মানুষের সাথে মিশে তাদেরকে সংশোধনের চেষ্টা করতে, যাকে বলা হয় ‘দাওয়াহ’
- নবীদেরকে শিশুকাল থেকেই বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সহযোগিতা করা হয়
- যারা আল্লাহর দ্বীনের শত্রু তারা সর্বদাই নবীদের বিরোধিতা করেছে ও তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে
- নবীদের সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছে ইহুদি জাতি

অনুশীলনী ৩৬

ক. তোমার পিতা /মাতা কিম্বা অভিভাবকের সহযোগিতা নিয়ে নিচের আয়াত টি পূর্ণ কর।

“স্মরণ কর, মারইয়াম তনয় ----------বলল: হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর -------- এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে -----------রয়েছে আমি উহার সমর্থক এবং আমার পরে ------------ নামে যে রাসূল আসবেন আমি তাঁর ----------------। পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট এলো তখন তারা বলতে লাগল, এটাতো এক স্পষ্ট ------------।” (সূরা সাফ: ৬১:৬)

পাঠ ৩

নবী হলেন যখন

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে পারবে,

- *সততা ও বিশ্বস্ততা একজন সফল ব্যবসায়ীর সর্বোত্তম গুণাবলি*
- *উত্তম চরিত্র সম্পদের চাইতেও অধিক মূল্যবান*
- *নির্জনে চিন্তামগ্ন হওয়া ও প্রার্থনা করা আত্মার পরিশুদ্ধির নির্দেশনা দেয়*
- *আল্লাহর পক্ষ হতে ওহী আসে ফেরেশতা জিব্রীল আ. এর মাধ্যমে*
- *ফেরেশতাদের আকার আকৃতি আমাদের চিন্তার বাহিরে*
- *ওহী হচ্ছে নির্ভুল জ্ঞান লাভের একমাত্র উৎস*
- *খাদিজা রা. ছিলেন একজন বুদ্ধিমতী ও সাহায্যকারী মহিলা*
- *তারাই নবীর দাওয়াতে সাড়া দেয়, যাদের আছে পবিত্র আত্মা ও উত্তম বুদ্ধিমত্তা*

নবী হলেন যখন

যুবক মুহাম্মদ সা. পেশায় ছিলেন একজন দক্ষ ব্যবসায়ী। ব্যক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ এবং বিশ্বস্ত। খাদিজা নামক এক ধনী বিধবা মহিলার ছিল বিশাল ব্যবসা। খাদিজা তার ব্যাবসার কাজে মুহাম্মদ সা. কে নিয়োগ করলেন।

খাদিজা মুহাম্মদ সা. এর বিশ্বস্ততা ও কর্ম দক্ষতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। খাদিজা বিবাহের প্রস্তাব পাঠালে মুহাম্মদ সা. তাকে বিবাহ করেন। খাদিজার গর্ভে মুহাম্মদ সা. ছয় সন্তান লাভ করেন।

এক পর্যায়ে নবী মুহাম্মদ সা. হেরা গুহায় ধ্যানে মগ্ন হতে লাগলেন। একদিন ফেরেশতা জিব্রীল আ. প্রথম ওহী নিয়ে তার কাছে আসলেন। নবী মুহাম্মদ সা. প্রথমে ভয় পেলেন এবং খাদিজার কাছে ছুটে গেলেন।

তার প্রিয়তম স্ত্রী খাদিজা তাকে অভয় ও সান্তনা দিলেন। অতঃপর খাদিজা তাকে নিয়ে খ্রিস্টান পন্ডিত ওয়ারাকার নিকট গেলেন। মুহাম্মদ সা. এর কাছ থেকে সবকিছু শুনে ওয়ারাকা খুশি হলেন। ওয়ারাকা বললেন, হেরা গুহায় যিনি এসেছিলেন, তিনি ফেরেশতা জিব্রিল আ.। আর মুহাম্মদ সা. হলেন সর্বশেষ নবী, যার বিবরণ আছে অতীতের ধর্মগ্রন্থ সমূহে।

অনুশীলনী ৩৭

ক. নিচের ঘরে রক্ষিত উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ব্যবসায়ী নিয়োগ নবী জিব্রীল ছয়
খুশি হেরা ওয়ারাকার গুনে খাদিজা

১. যুবক মুহাম্মদ সা. পেশায় ছিলেন একজন দক্ষ ------------।

২. -------------- নামক এক ধনী বিধবা মহিলার ছিল বিশাল ব্যবসা।

৩. খাদিজা তার ব্যাবসার কাজে মুহাম্মদ সা. কে --------- করলেন।

৪. খাদিজা মুহাম্মদ সা. এর --------মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করেন।

৫. খাদিজার গর্ভে মুহাম্মদ সা. -------- সন্তান লাভ করেন।

৬. নবী মুহাম্মদ সা. ------- গুহায় ধ্যানে মগ্ন হতে লাগলেন।

৭. ফেরেশতা ---------- আ প্রথম ওহী নিয়ে তার কাছে আসলেন।

৮. খাদিজা মুহাম্মদ সা. কে নিয়ে খ্রিস্টান পন্ডিত -------- নিকট গেলেন।

৯. মুহাম্মদ সা. এর কাছ থেকে সবকিছু শুনে ওয়ারাকা-------- হলেন।

১০. ওয়ারাকা বললেন, মুহাম্মদ সা. হলেন সর্বশেষ -----------।

যৌবনকাল ও নবুয়ত লাভ
পর্ব ১: খাদিজার সাথে বিবাহ

মুহাম্মদ সা. চাচা আবু তালেব এর তত্ত্বাবধানে মক্কায় বেড়ে ওঠেন। আবু তালেব ছিলেন একজন দক্ষ ব্যবসায়ী। ব্যবসার বড় কাফেলা নিয়ে তিনি সিরিয়া ইয়ামান সহ দূরদেশে যাতায়াত করতেন। মুহাম্মদ চাচার সাহচর্যে ব্যবসার নানা কলা কৌশল সহজেই আয়ত্ত করেছিলেন। আর ব্যক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং সৎ। ফলে মক্কায় সেই সময়ে মুহাম্মদ সা. এর মত দক্ষ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী দ্বিতীয় কেউ ছিলোনা।

মক্কায় একজন ধনাঢ্য মহিলা বাস করতেন। রূপ সৌন্দর্য ও জ্ঞানেগুণে তিনি ছিলেন অসাধারণ। তার নাম হলো খাদিজা। তবে তিনি ছিলেন বিধবা। তিনি মক্কার অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মতো কৃপণ এবং অহংকারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল মহিলা। বিরাট ব্যবসা বাণিজ্য ছিল তার। নিজের ব্যবসা পরিচালনার জন্য তিনি একজন দক্ষ লোকের খোঁজ করছিলেন। লোকদের মাধ্যমে তিনি জানতে পারলেন, মুহাম্মদ শুধু একজন দক্ষ ব্যবসায়ী নন, তিনি একজন সৎ এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিও।

খাদিজা মুহাম্মদ সা. কে তার ব্যবসার দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দিলে মুহাম্মদ সা. তাতে সম্মত হন। মুহাম্মদ সা. এর দক্ষ হাতের পরিচালনায় খাদিজার ব্যবসায় খুব ভালো মুনাফা আসতে থাকে। কিন্তু অধিক মুনাফা যতটুকু না খাদিজাকে খুশি করল, তার চেয়ে বেশি খুশি করল মুহাম্মদ সা. এর বিশ্বস্থতা এবং তার সত্যনিষ্ঠা। মুহাম্মাদ সা যখন ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে সিরিয়া গিয়েছিলেন, মায়সারা নামের খাদিজার দাসী সেই কাফেলার সঙ্গী ছিল। মায়সারা দীর্ঘ যাত্রা পথে মুহাম্মদ সা. এর অসাধারণ সব গুণাবলি দেখে বিস্মিত হয়েছিল। খাদিজা

তার দাসী মায়সারার মুখে মুহাম্মদ সা. এর চরিত্রের নানামুখী উন্নত গুণাবলির কথা শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন।

কিছুদিন পর খাদিজা স্বপ্রণোদিত হয়ে মুহাম্মদ সা. এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। মুহাম্মদ সা. তার চাচার পরামর্শ গ্রহণ করেন। চাচা আবু তালেব সম্মতি প্রদান করলে উভয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়। আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দুজনের মধ্যে ছিল অসাধারণ মিল। দুজনেরই উচ্চ বংশে জন্ম। দুজনের মধ্যেই ছিল সততা, বিশ্বস্থতা এবং অসাধারণ সব ভালো গুণাবলি। ফলে এই বিবাহ তাদের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি নিয়ে এসেছিল। নবী মুহাম্মদ সা. খাদিজার গর্ভে ছয় সন্তান লাভ করেছিলেন।

পর্ব ২: হেরাগুহায় নির্জনে

সেই সময়ে মক্কার লোকেরা মূর্তির পূজা করত। মুহাম্মদ সা. ছিলেন তাদের মধ্যে ব্যতিক্রম। তিনি এক আল্লাহতে বিশ্বাস করতেন। তিনি মক্কার লোকদের মূর্তি পূজা দেখে মনে মনে খুব কষ্ট পেতেন। তাদের মদ্যপান, জুয়া খেলা, চুরি ডাকাতি দেখে তার মন দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো। তিনি যখন দেখতেন আরবের লোকেরা অসহায়, দুর্বল ও বিধবাদের প্রতি অহরহ অন্যায় ও জুলুম করে চলছে, তার অন্তর তখন কেঁদে উঠত। আর এতিমদের দুঃখ কষ্ট দেখলে তার নয়ন গড়িয়ে অশ্রু ঝরত। কারণ তিনি নিজেও এতিম ছিলেন। তিনি জানতেন, এতিমদের দুঃখ অনুভব করা ও তাদের দেখাশুনা করা কত জরুরী।

তখনকার সময়েও মক্কা ব্যস্ত নগরী ছিল। শহরের কোলাহল তার কাছে অপ্রিয় হতে লাগল। তার মন চাইতো নিরিবিলি কোথাও গিয়ে একা একা আল্লাহর বন্দেগী করতে। মক্কার অনতি দূরে জাবালে নূর নামক পাহাড়ে একটি নির্জন গুহা ছিল। এটা ছিল ‘হেরাগুহা’ নামে পরিচিত। তিনি সেই গুহায় নিয়মিত

যাতায়াত করতে লাগলেন। সেখানে বসে তিনি ধ্যান মগ্ন হতেন। আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ভাবতেন। চিন্তা করতেন, কিভাবে দিশেহারা জাতিকে মন্দ পথ থেকে ভালোর দিকে নিয়ে আসা যায়। এভাবে তার ছয়মাস চলে গেল। মুহাম্মদ সা. তখন ৪০ বছরে উপনীত। তিনি তখন একাধারে দুই তিন দিন পর্যন্ত গুহায় কাঠাতে লাগলেন। তার মমতাময়ী স্ত্রী খাদিজা তার কাছে প্রতিদিন খাদ্য পৌঁছে দিতেন।

পর্ব ৩: জিব্রীল আ. এর আগমন

রমজান মাসের কোন এক রাতে তিনি হেরা গুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন আছেন। চারিদিকে সুনসান নীরবতা। আকাশে উজ্জ্বল তারকার ঝলকানি। তিনি প্রার্থনা করছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন গুহার ভিতর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এটা ছিল এক অসাধারণ উজ্জ্বলতা যা তিনি কখনো দেখেননি। তিনি একটি আওয়াজও শুনতে পেলেন। কে একজন তাকে বলছে, ‘পড়’। তিনি ছিলেন ফেরেশতা জিব্রীল আ.।

আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করেছিলেন। জিব্রীল আ. এর ‘পড়’ নির্দেশ শুনে মুহাম্মদ সা. তার দিকে মাথা তুলে তাকালেন। তিনি দেখলেন, ফেরেশতা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত গোটা আকাশ ঢেখে ফেলেছেন। তিনি উপরে তাকালেও দেখতে পাচ্ছেন ফেরেশতা। নিচের দিকে তাকালেও সেই একই ফেরেশতা। মুহাম্মদ সা. তার জীবনে কখনো এত বিশাল কিছু দেখেননি। ফেরেশতা জিব্রীল এর ‘পড়’ নির্দেশের জবাবে মুহাম্মদ সা. বললেন ‘আমি পড়তে জানিনা’।

সেই সময়ে মক্কার অধিকাংশ লোকই লেখা পড়া জানত না। ফেরেশতা তাকে বুকে ধরে চাপা দিলেন অতঃপর ছেড়ে দিয়ে বললেন ‘পড়’। তিনি আবার ও বললেন, ‘আমি পড়তে জানি না।’ দ্বিতীয়বার ফেরেশতা তাকে ধরে চাপা

দিলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন ‘পড়’। মুহাম্মদ সা. ও সেই একই উত্তর দিলেন ‘আমি পড়তে জানি না।’ তৃতীয়বার ফেরেশতা তাকে ধরে এত জোরে চাপ দিলেন যে, তার মনে হলো তার অন্তর আত্মা বেরিয়ে আসবে। অতঃপর তাকে বললেন ‘পড়ো তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।’ মুহাম্মদ সা. তখন সেই কথাগুলো জিব্রীল আ. এর সাথে সাথে পড়ছিলেন।

পর্ব ৪: নবুয়তের স্বীকৃতি

হঠাৎ গুহার ভিতরের অস্বাভাবিক আলো বিলীন হয়ে গেল। মুহাম্মদ সা. দারুন ভাবে ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন, তিনি সেখানে একা। তিনি গুহা থেকে বের হয়ে মক্কার দিকে রওনা হলেন। তিনি মক্কার দিকে যাচ্ছিলেন, আবারও তার কাছে আজ আসছিল, হে মুহাম্মদ ! তুমি হচ্ছ আল্লাহর নবী আর আমি হচ্ছি ফেরেশতা জিব্রীল। মুহাম্মদ সা. আকাশের দিকে তাকালেন। দেখলেন, গুহায় আগত সেই ফেরেশতা। তিনি যেদিকেই তাকাচ্ছেন এই বিশাল দেহি ফেরেশতাকে দেখতে পাচ্ছেন।

অবশেষে তিনি মক্কায় এসে পৌঁছলেন। ঘরে ঢুকেই তিনি খাদিজাকে সবকিছু খুলে বললেন, তার শরীর তখনও কাঁপছে। খাদিজা তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। খাদিজা বুঝতে পারলেন, যা ঘটে গেছে নিঃসন্দেহে তা ভালো কিছু হবে। খাদিজা ছিলেন বুদ্ধিমতী মহিলা। তিনি মুহাম্মদ সা. কে এই বলে সান্তনা দিলেন, *“আল্লাহর কসম, আল্লাহ কখনো আপনার কোন ক্ষতি হতে দেবেন না। আপনি আত্মীয়দের সাথে ভাল সম্পর্ক, মেহমানদের আদর আপ্যায়ণ করেন, বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিদের সহায়তা করেন মজলুমের পাশে দাঁড়ান ও সত্যের পক্ষে থাকেন।”*

এই উক্তির মাধ্যমে খাদিজা একদিকে যেমন তার মনের ভীতি দূর করলেন

অন্যদিকে তার উত্তম চরিত্রের উন্নত গুণাবলিগুলো তুলে ধরে তার নবী হওয়ার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করেন। খাদিজা ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইলেন। তাই তিনি মুহাম্মদ সা. কে নিয়ে তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেল এর কাছে গেলেন। মক্কায় সে ব্যক্তি ছিল অত্যন্ত পন্ডিত এবং আসমানী কিতাব সম্পর্কে তার ছিল ভালো জ্ঞান।

বিস্তারিত ঘটনা শুনার পর, তার চেহারায় উজ্জ্বলতা দেখা দিল। অতপর ওয়ারাকা বললেন, “ইনি সেই জিব্রীল যিনি মুসা আ. এর কাছে আগমন করতেন। এটা পরিষ্কার যে, মুহাম্মদ সা. হচ্ছেন সর্বশেষ নবী। কিন্তু একটু পরেই ওয়ারাকা অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে বললেন, দুনিয়ার যে মানুষই এই ধরনের বাণী প্রাপ্ত হয় তারা তাদের জাতির লোকদের দ্বারা নির্যাতিত হন এবং নিজ অঞ্চল হতে বিতাড়িত হন। তোমার ক্ষেত্রেও তাই ঘটবে হে মুহাম্মদ সা.। তবে সেই সময় পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকলে আমি তোমার সহযোগী হবো যদিও আমি বয়োবৃদ্ধ। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ওরাকা মারা যান।

এই গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্ন লিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক ও অভিভাবক শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন

- সেরা এবং সবচেয়ে সফল ব্যবসায়ীরা হলেন তারা যারা সৎ ও সত্যবাদী
- নারীরা ব্যবসার মালিক হতে পারেন এবং সম্পদ অর্জন করতে পারেন।
- ধনী ব্যবসায়ী নারীর পুরুষ পরিচালক থাকা ভালো এবং সরাসরি নিজেদের লেনদেন পরুষদের সাথে না করা উচিত। এইভাবে তাদের আভিজাত্য এবং সততা সুরক্ষিত থাকবে।
- বেশিরভাগ ধনী ব্যক্তিরা দয়ালু হন না এবং উদারতা দেখান না
- শুধুমাত্র যারা সৎ ও সত্যবাদী তাদের ব্যবসায়িক কাজে নিয়োগ করুন
- সততা হল আর্থিক সাফল্য লাভের পূর্ব শর্ত
- চরিত্র এবং নৈতিকতা সম্পদের চেয়েও মূল্যবান
- শুধুমাত্র তাদেরই বিয়ে করুন যাদের আছে ভালো চরিত্র ও নৈতিকতা
- ভাল চরিত্র এবং নৈতিকতা একটি সুখী বিবাহিত জীবন নিশ্চিত করে
- নবীগণ এক আল্লাহকে বিশ্বাস করেন। এমনকি নবী হওয়ার আগেও।
- নবীরা সবসময় উদ্বিগ্ন থাকেন তাদের জনগণের দুর্দশা সম্পর্কে, এমনকি নবী হওয়ার আগেও।
- শৈশবকালীন কঠিন জীবন মুহাম্মদ সা. কে অন্যদের দুর্দশা বুঝতে ও মহৎ হতে শিখিয়েছে
- ধ্যান এবং প্রার্থনা অন্তর্দৃষ্টি এবং আত্ম উপলব্ধির দিকে পরিচালিত করে
- শান্তি এবং প্রশান্তি জন্য প্রয়োজন ধ্যান ও প্রার্থনা
- ধ্যান এবং প্রার্থনা হল জ্ঞানীদের গুণাবলি
- অধিকাংশ নবী চল্লিশ বছর বয়সে ওহী গ্রহণ করেন
- ফেরেশতা জিবরাঈল হলেন ওহীর ফেরেশতা
- ফেরেশতারা আমাদের মহাবিশ্বের চেয়েও বিরাট
- ফেরেশতারা নূর বা আলো থেকে তৈরি
- আল্লাহর প্রথম আদেশ পড়া এবং জ্ঞান অর্জন করা।
- সবচেয়ে বড় জ্ঞান হল ওহীর জ্ঞান, বিশেষ করে কুরআন এর জ্ঞান।
- প্রাচীন কালে নিরক্ষরতা ছিল অতি সাধারণ বিষয়
- প্রথম অহিতে পড়তে বলা ইঙ্গিত করে যে, আল্লাহ নিজেই নবী মুহাম্মদ সা. এর শিক্ষক
- আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) প্রদত্ত জ্ঞান এবং প্রশিক্ষণ হল সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা
- মানুষ সবসময় তাকে ভয় পায় যা তারা বোঝে না
- আল্লাহ নবীগণকে মনোনীত করেন, কিন্তু কেউ নিজে নিজেই নবী হতে পারে না
- খাদিজা ছিলেন একজন বুদ্ধিমতী, স্বামীকে সহযোগিতাকারী স্ত্রী।
- খাদিজা ছিলেন একজন জ্ঞানী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নারী।
- প্রথম দিকের খ্রিস্টানরা ওহীর জ্ঞান এবং শিক্ষার প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। তাই তারা মুহাম্মদ সা. কে
- দেখেই তার নবী হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন
- শুধুমাত্র যারা বিশুদ্ধ হৃদয় এবং সৎ প্রবন কেবল তারাই নবীদের আহবানে সাড়া দেয়।

অনুশীলনী ৩৮

ক. নবী মুহাম্মদ সা. এর প্রতি প্রথম ওহী হিসাবে নাজিল হয়েছিল সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত। নিচের খালি স্থানে সূরা আখলাকের ১-৫ নং আয়াতের বাংলা অনুবাদ লিখ।

____

____

____

____

____

খ. গুহার ভিতরের আরবি শব্দটি রং কর অতঃপর তোমার পিতা / মাতার সাহায্য নিয়ে শব্দটির বাংলা অর্থ লিখ।

অর্থ:______________________________

হিকায়াতুস সাহাবা
(সাহাবীদের জীবনী)

ইসলাম তার সূচনা লগ্ন থেকেই এত মারাত্মক আক্রমণের শিকার হয়েছিল যে এটা যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের উপর হত, তাহলে সে ধর্ম বিলীন হয়ে যেত, মোটেই টিকে থাকতে পারত না। এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হল ইসলাম। শত আঘাত ও ঝড় ঝঞ্ঝা সহ্য করে দীর্ঘকাল ইসলাম তার স্বকীয়তা এবং বিশুদ্ধ আদর্শ নিয়ে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

ইসলামের অভ্যন্তরে যে সমস্ত বিপথগামী গ্রুপ রয়েছে তারা একদিকে যেমন ইসলামকে আক্রমণ করেছে, তেমনি বহির শত্রুদের আক্রমণে যুগে যুগে ইসলাম হয়েছে রক্তাক্ত। খ্রিস্টিয়ান ক্রুসেডার এবং মঙ্গোলিয়ানরা ইসলামকে দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, ইসলাম যদি অন্যান্য ধর্মের মত হত, তাহলে এসব আক্রমণে ইসলামের অস্তিত্ব চিরতরেই বিলীন হয়ে যেত এবং ইসলামের মূল শিক্ষাকে ইতিহাস থেকে খোঁজ ে পাওয়া যেত না। কিন্তু ইসলাম তার অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলার পাশাপাশি বহির শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করে আজ পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিতে দুনিয়ার বুকে টিকে আছে।

এসব আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ইসলামকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর আহ্বানও জানানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল কোরআন এবং হাদিসের নতুন ব্যাখ্যা দিতে হবে, যাতে দুনিয়ার মানুষ এগুলোকে সহজ করে গ্রহণ করে নেয়। ইসলামকে তার মৌলিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত করেই এগুলোর মোকাবেলা করার জন্য বলা হয়েছিল। এমনি প্রেক্ষাপটে মনে হতো যেন ইসলাম এই সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝার মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু ইসলামের প্রকৃত অনুসারীরা ইসলামের সামান্য বিকৃতি ও মূল আদর্শ থেকে কোন ধরনের বিচ্যুতি কে কখনো গ্রহণ করেননি। তারা কারো সাথে কোন ধরণের সমঝোতায় যাননি। কিংবা ইসলামের বিভ্রান্তিকর কোনো ব্যাখ্যা দিতেও তারা সম্মত হননি। তাদের সেই সত্যনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগই আজ পর্যন্ত ইসলামকে আমাদের কাছে একটি অবিকৃত এবং সম্পূর্ণ অক্ষত ধর্ম হিসেবে পরিচিত করতে সক্ষম হয়েছে।

আল্লাহপাক তার বিশেষ মেহেরবানীতে প্রতি যুগে এমন একজন কর্ণধার পাঠিয়েছেন যিনি সেই যুগের সব ধরনের বিকৃতি থেকে ইসলাম কে রক্ষা করেছেন। এ সকল মহান ব্যক্তিরা ইসলামকে যুগের সব ধরনের বিকৃতি এবং আক্রমণ থেকে রক্ষা করে মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি জীবনীশক্তি উজ্জীবিত করেছিলেন যার ফল শ্রুতিতে ইসলামের শত্রুদের সব ধরনের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হতে বাধ্য হয়েছিল। এটা ছিল আল্লাহর মেহেরবানী, যেন কিয়ামতের আগ পর্যন্ত যত মানুষ এ দুনিয়াতে আগমন করে তাদের প্রত্যেকে এই দ্বীন থেকে সঠিক হেদায়েত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

নবী মুহাম্মদ সা.ল্লাম এর দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের পর যে চারজন খলিফা মুসলিম উম্মাহকে ইসলামী আদর্শের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করেছিলেন তাদেরকে বলা হয় খোলাফায়ে রাশেদীন বা সঠিক পথপ্রাপ্ত খলিফাগণ। এটা ছিল ইসলামের স্বর্ণযুগ। এ যুগে তারা যে সমস্ত বিষয় বাস্তবায়িত করেছিলেন তা ছিল সকল যুগের মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয়।

তারা তাদের শাসন পরিচালনা করেছিলেন কোরআন এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে। পরবর্তীতে অনেক শাসক মুসলমানদের রাষ্ট্র পরিচালনা করলেও তারা সে সময়ের মত আদর্শিকভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হননি। অনেকেই অনেক ক্ষেত্রে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। কিন্তু মুসলিম উলামাদের একটি বিশেষ দল সবসময়ই খলিফাদের এই সমস্ত ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য তৎপর ছিলেন এবং এসব বিষয়ে মুসলিম জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পরবর্তী শাসকদের অনেকেই তাদের শাসনকালে অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন এবং নতুন নতুন রেকর্ড তৈরি করেছেন। কিন্তু সবকিছুর পরে তাদের কার্যক্রম গুলো বিবেচিত হয়েছিল প্রথম যুগের সেই খোলাফায়ে রাশেদীনদের পরিচালনার আলোকে। সত্য পথপ্রাপ্ত খলিফাদের ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের আলোকেই পরবর্তী শাসকদের জীবন ও শাসনকে মূল্যায়ন করা হত।

খোলাফায়ে রাশেদীনদের চরিত্রের অনেকগুলো ব্যতিক্রমধর্মী ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল। এসব বৈশিষ্ট এতই অসাধারণ ছিল যে, শুধু ইসলামের ইতিহাস নয় বরং বিশ্বের ইতিহাসে এগুলো ছিল অতুলনীয় ও বিরল। এসব তাদের পক্ষে করা সম্ভব হয়েছিল এ কারণে যে তারা স্বয়ং নবী মুহাম্মদ সা. দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন ও তার দেখানো পথে তারা চলতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন।

তাদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা খুব সহজ সরল জীবন পরিচালনা করতেন,ও দায়িত্বের ব্যাপারে তারা ছিলেন খুবই সচেতন। তারা একদিকে ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু এবং কোমল হৃদয়ের অধিকারী আবার অন্যদিকে মুসলমানদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে সমুন্নত রাখা এবং মুসলমানদের রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তারা ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও দৃঢ়পদ। শত্রুর সাথে যুদ্ধের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন পাহাড়ের চাইতে মজবুত। জনগণের সেবাকেই তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্যতম মাধ্যম মনে করতেন। দুঃখী অসহায় ও নির্যাতিত মানুষেরা তাদের কাছে শান্তির আশ্রয় পেতো। সবার সাথে সমান ও ন্যায় সঙ্গত আচরণ করতেন এবং তাদের জীবনে কখনো পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা যায়নি। তাদের ত্যাগ এবং আন্তরিকতার উপর মুসলমানদের ছিল গভীর আস্থা। তাদের সকলেরই ছিল রসুলের প্রতি অগাধ ভালোবাসা। রাসূলের শিক্ষার সামান্যতম বিকৃতিও তারা সহ্য করতেন না।

খোলাফায়ে রাশেদিনের গড়া সেই রাষ্ট্রের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি, বর্তমান সময়ে যদি কেউ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে প্রথমেই তাদেরকে চরিত্রের সংশোধন করতে হবে। মানুষের চরিত্রের সংশোধনের পাশাপাশি তাদেরকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে হবে যারা একটি রাষ্ট্র পরিচালনা উপযোগী সৎ ও যোগ্য নাগরিক হবে। মুসলমানদেরকে এটা বোঝাতে হবে যে কোরআন এবং সুন্নাহ হচ্ছে মূল ইসলাম। এর আলোকেই আমাদের জীবন পরিচালনা করতে হবে। ব্যক্তি জীবনকে ঢেলে সাজাতে হবে কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে। রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথে। সেই সাথে রাসুলের সাহাবীগণ যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন তা হবে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য আদর্শ নমুনা।

পাঠ ১

সাইয়েদুনা আবু বকর রা.

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে পারবে,

- *ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক রা. এর জীবন ও কর্ম কেমন ছিল*
- *দ্বীনের জন্য আত্মত্যাগ এবং আল্লাহর কাছে দেয়া ওয়াদা পরিপূর্ণ করা দ্বারাই মুসলমানের সম্মান এবং মর্যাদা নির্ধারিত হয়*
- *ইসলাম এবং মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জিহাদ পরিচালনা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ ।কমপক্ষে এ জাতীয় জিহাদকে সমর্থন করা প্রত্যেকের জন্য জরুরী।*
- *আল্লাহর দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হলো দুনিয়ার সম্পদের প্রতি মোহ, সন্তানের প্রতি ভালবাসা ও দুনিয়াবী স্বার্থসুবিধা হারিয়ে যাওয়ার ভয়।*
- *একজন প্রকৃত মুসলিম সব সময় ইসলামের জন্য তার খেদমত উৎসর্গ করতে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। যখনই এই ধরনের সুযোগ তার সামনে আসে সে এটা কে কখনো হাতছাড়া করে না।*

সাইয়েদুনা আবু বকর রা.

আবু বকর সিদ্দিক রা. ছিলেন নবী মুহাম্মদ সা. এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সাহাবী। আবু বকর ছিলেন পুরুষের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, সত্যবাদী এবং ধর্মভীরু ব্যক্তি।

তিনি তার সমস্ত সম্পদ ইসলামের জন্য ব্যয় করেছিলেন। অনেক লোক আবু বকরের প্রচেষ্টায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তিনি সর্বদা শত্রুদের থেকে মহানবী সা. কে রক্ষা করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি তার সময় ও সম্পদ দিয়ে নবী মুহাম্মদ সা. কে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

নবী মুহাম্মদ সা. এর মৃত্যুর পর আবু বকর ইসলামের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ পরিচালনা করে দারুণভাবে সফল হয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ, দূর দৃষ্টি সম্পন্ন ও কোমল হৃদয় রাষ্ট্রনায়ক। বিশাল ক্ষমতা ও প্রভাব থাকা সত্বেও তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন। আবু বকর সিদ্দীক রা. ছিলেন সকল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম ব্যক্তি। সকল নবীর উম্মতের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবেন।

অনুশীলনী ৩৯

ক. নিচের বাক্যটি রং কর অতঃপর সুন্দর করে ৩ বার লিখ।

আবু বকর রা. ছিলেন সকল যুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম।

১. ______________________________

____

২. ______________________________

____

৩. ______________________________

____

খ. নিচের আরবি নামটি রং কর অতঃপর তার সম্পর্কে তিনটি অর্থপূর্ণ বাক্য লিখ।

أبو بكر

১. ______________________________

____

২. ______________________________

____

৩. ______________________________

____

ইসলামের জন্য সম্পদ উৎসর্গ

"*রোমান সৈন্যরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে*" সংবাদটি দ্রুত মদিনার ছড়িয়ে পড়ল। রোমানদের লক্ষ্য হল, তারা তাদের শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী দিয়ে মুসলমানদের অস্তিত্ব দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে মিটিয়ে দেবে। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় হাবিব মুহাম্মদ সা. বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহর অনুগ্রহে মুসলমানরা অবশ্যই-রোমানদেরকে পরাজিত করবে। রোমানদেরদের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য মুহাম্মদ সা. মুসলিমদের সামনে অগ্রসর হয়ে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার আহবান জানালেন। আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের হেফাজতের জন্য মুসলিমগণ প্রস্তুত। তারা এবার অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে শক্তিশালী হয়ে রোমানদের মোকাবেলা করবে ইনশাল্লাহ।

কিন্তু এটি কোন সহজ যুদ্ধ ছিল না। মুসলমানদের জন্য ছিল এটা একটি বিরাট পরীক্ষার সময়। এ মুহূর্তে তাদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যের প্রয়োজন। বিশেষ করে তখন চলছিল গ্রীষ্মকাল। গাছে গাছে পাকা খেজুর, ফসল তুলার ভরা মৌসুম। এ ফসলই তাদের সারা বছরের খাদ্যের যোগান দেয়। তাছাড়া দীর্ঘ মরুময় পথ পাড়ি দিয়ে শত্রু ক্যাম্পে পৌঁছতে মুসলমানদের প্রয়োজন ছিল প্রচুর পরিমাণে পানযোগ্য পানির।

প্রশ্ন হলো এগুলো আসবে কোত্থেকে? কে নবীর এই আহ্বানে এখন সাড়া দেবে? প্রচন্ড এই গরমে খেজুর তুলার মৌসুমে এই জেহাদে অংশ নেবে করা? কারা নিজেদের পরিবার-পরিজন এবং আরামের জীবনযাপন পরিত্যাগ করে প্রচন্ড শক্তিধর রোমানদের মোকাবেলায় বেরিয়ে পড়বে? বিশেষ করে এই জিহাদের ব্যয় বহন করার জন্য কারা স্বেচ্ছায় তাদের ধন-সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দেবে? কারা বিলিয়ে দেবে তাদের যুদ্ধের ঘোড়া, যুদ্ধাস্ত্র এবং কাপড়-চোপড় মুসলিম সৈন্যদের জন্য?

এ কঠিন সময়ে যারা বিশ্বাসের দিক থেকে ছিল খুবই দুর্বল কিংবা যাদের অন্তরে প্রকৃত বিশ্বাস ছিল না তারা আসলে পিছুটান দিল। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমানরা কঠিন এ মুহূর্তে নবীর আহবানে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি এ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। আল্লাহর প্রতি তার নিখাদ বিশ্বাস ও আল্লাহর রাসূলের জন্য তার অগাধ ভালোবাসা প্রমাণের এটাই তার জন্য সুবর্ণ সুযোগ। তিনি দ্রুত ঘরে চলে গেলেন এবং তার পরিবারকে নির্দেশ দিলেন ঘরে যা কিছু আছে সব কিছুকে একসাথে জড়ো করার জন্য।

তারপর তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, মনোযোগ দিয়ে শোনো, সবগুলো সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করে নাও। একভাগ আমাদের পরিবার-পরিজনের জীবন যাপনের জন্য আর বাকি অর্ধেক আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য জিহাদের উদ্দেশ্যে সাদকা করবো। উমরের স্ত্রী তার কথামত সকল সম্পদকে দুভাগে ভাগ করলেন। প্রতি ভাগেই পড়েছিল প্রচুর কাপড়-চোপড়, তরবারি, খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য সম্পদ। উমারের স্ত্রী তার সঞ্চিত গয়না পত্রের অর্ধেকও এনে হাজির করলেন। সব শেষে উমারের স্ত্রী একজোড়া কানের রিং ওমরের হাতে তুলে দিলেন। উমার বললেন, "আমি কি তোমাকে অর্ধেক দেওয়ার কথা বলি নাই"? তুমি কেন তোমার কানের দুটি রিং ই দিয়ে দিলে"। তার স্ত্রী হেসে বললেন, একটি রিং যদি দেই, তাহলে কে তা কিনবে এবং যে একটি আমার জন্য থাকবে তা কি আমি পড়তে পারব? তার চেয়ে কি এটা ভাল নয় যে, আমি দুটি ই দিয়ে দিলাম। স্ত্রীর কথায় উমার অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

"*অবশেষে ভাল পরিমাণের একটি সম্পদ নিয়ে রসুলের হাতে দিতে পারবেন।*" এ কথা চিন্তা করে উমার মনে মনে আনন্দিত হচ্ছিলেন। উমার অনেক কষ্টে বড় বোঝাটি নিজের কাঁধে উঠালেন আর বাকি ছোটখাটো জিনিসপত্র তার

সন্তানরা তার পিছনে নিয়ে আসছিল। নবী মুহাম্মদ সা. এর ঘরে যাওয়ার পথে পথিমধ্যে তিনি আবু বকরকে দেখলেন। একই উদ্দেশ্যে তিনিও নবীজির ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। উমার দেখলেন, আবু বকর খুব একটা বড় কিছু বহন করে আনছেন না। আবু বকর যা বহন করছেন তা তার বোঝার চাইতে অনেক ছোট। উমার মনে মনে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, "অন্তত এবারে আমি আবু বকরের চাইতে বেশি কিছু ছদকা করতে পারছি"। উমার মনে আনন্দ নিয়েই নবীজির ঘরে প্রবেশ করলেন।

"আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এসব আমি পেশ করলাম। এগুলো আপনি স্বাধীনভাবে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করতে পারেন, হে আল্লাহ রাসুল!" উমার শান্ত কণ্ঠে বললেন। *"তুমি তোমার পরিবার পরিজনের জন্য কি রেখে এসেছো, হে উমার!"* দয়াল নবী উমারের চেহারার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন। নবী মনে মনে ভাবছিলেন ওমর হয়তো তার সম্পদের অধিকাংশই নিয়ে এসেছেন এবং সামান্য কিছু হয়তো পরিবার-পরিজনের জন্য রেখে এসেছেন। উমার বললেন, আপনি চিন্তা করবেন না, আমি পরিবার পরিজনের জন্য অনেক কিছু রেখে এসেছি। নবীজি বললেন, *"তার পরিমাণ কেমন উমার?"*

উমার উত্তর দিলেন, *"আমি আমার সম্পদকে দু'ভাগ করে একভাগ এখানে নিয়ে এসেছি এবং একভাগ পরিবার পরিজনের জন্য রেখে দিয়েছি।"* নবী মুহাম্মদ সা.ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসলেন। তার হাসিতে যেন সন্তুষ্টি প্রকাশ পাচ্ছে। এখন হচ্ছে আবু বকরের পালা। তিনি খুব স্বল্প পরিমাণ সম্পদ এনে নবীজির সামনে রাখলেন। নবীজি তাকে একই প্রশ্ন করলেন যেমনটি করেছিলেন উমারকে, *"কী পরিমাণ তুমি তোমার পরিবার পরিজনের জন্য রেখে এসেছো, হে আবু বকর!"* আবু বকর এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। তিনি পছন্দ করেন না, লোকজন তার দানের বিষয়টি বিস্তারিত জানুক। কিন্তু

সেই একই ভাবে তিনি আল্লাহর রাসূলের প্রশ্নের উত্তর না দেওয়াও পছন্দ করেন না। বাধ্য হয়েই তিনি বললেন, *“আমি আমার পরিবার পরিজনের জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকেই রেখে এসেছি। আল্লাহ তাদের দেখাশোনা করবেন, আর আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন তার উপর আমল করলে সেই আমল তাদেরকে সহযোগিতা করবে। আপনার কাছে আমার সম্পদের সবকিছুই নিয়ে এসে হাজির হয়েছি। কিছুই ঘরে রাখিনি”*। নবী মুহাম্মদ সা. উজ্জ্বলভাবে মুচকি হেসে বুঝালেন, আবু বকরের এই কাজকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেছেন। আবু বকর রা. আবারও প্রমাণ করলেন, তিনি যে কোন মুসলমানের চাইতে আল্লাহ এবং তার রাসূলকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। আল্লাহ এবং তার রাসুলের জন্য তিনি সবকিছু উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত। দ্বীন ইসলাম কে তিনি তার জীবন এবং পরিবার পরিজনের চাইতে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। উমার রা. ঘরে ফিরে গেলেন। তবে তার চেহারায় কিছুটা মলিনতা ছিল। তিনি বেশি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এবারও তিনি আবু বকর রা. এর চাইতে নিজেকে ইসলামের জন্য বেশি উৎসর্গিত প্রমাণ করতে পারেননি।

ইসলাম গ্রহণের দিন থেকে আবু বকর মুহাম্মদ সা. এর জন্য সব কিছু উৎসর্গ করে আসছিলেন। যখন যা কিছুর প্রয়োজন পড়েছে তিনি তা নির্দ্বিধায় করে আসছিলেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে যে সব ক্রীতদাস মক্কায় নির্যাতিত হতো এমন অনেককে তিনি নিজ সম্পদ দিয়ে কিনে মুক্ত করেন দেন। হিজরতে নবীজির সঙ্গী ও হয়েছিলেন একমাত্র তিনি। আবু বকর রা. আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে যে পরিমাণ ভালোবাসেন, এই ভালবাসা অন্য কারো পক্ষে দেখানো সম্ভব নয়। উম্মতের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই যে আবু বকর রা. এর চাইতে ইসলামের জন্য বেশি উৎসর্গিত। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্য উৎসর্গের ক্ষেত্রে আবু বকর রা. অনন্য ও তুলনাহীন।

এই গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্ন লিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক ও অভিভাবক শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন

- রোমানরা ছিল ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু
- আল্লাহর সাহায্য থাকলে শত্রু যত বড়ই হোক সে পরাজিত হবেই
- ইসলামের কঠিন মুহূর্তে সকল মুসলমানের উপর জিহাদ করা ফরজ হয়ে যায়
- কেউ সরাসরি যুদ্ধে যেতে না পারলেও তাকে অবশ্যই আর্থিকভাবে যুদ্ধের সহযোগিতা করা উচিত
- ঐক্য এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস বিজয়ের জন্য পূর্ব শর্ত
- জিহাদ হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে আল্লাহ প্রকৃত ঈমানদারদের মুনাফিকদের থেকে পৃথক করেন
- পরিবার এর প্রতি ভালোবাসা বা সম্পদ হারানোর ভয় আল্লাহর পথে কাজ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা
- একজন প্রকৃত ঈমানদার তার পরিবার-পরিজন ও সম্পদের চাইতে আল্লাহকে বেশি ভালোবেসে থাকে
- এটি একটি উত্তম পন্থা যে পরিবার পরিজনের জন্য কিছু সম্পদ রেখে যাওয়া
- প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি সবসময়ই ইসলামের জন্য খেদমত করার সুযোগের অপেক্ষায় থাকে
- সত্যিকারের ঈমানদার ব্যক্তি সর্বদা দ্বীনের জন্য এমন বিষয় উৎসর্গ করতে চায় যা তার আছে সবচেয়ে প্রিয়
- মুসলিম পরিবারের সকলকেই ইসলামের খেদমতের জন্য পরিবারের কর্তা ব্যক্তির সহযোগী হওয়া উচিত
- মুসলমান কেবল ভালো কাজে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে
- আল্লাহর প্রতি যার যত মজবুত আস্তা রয়েছে সেই আল্লাহর তত বেশি নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম
- আল্লাহ তাঁর প্রকৃত বান্দাদেরকে কখনো একা ছেড়ে দিয়ে ধ্বংস হতে দেন না
- আবু বকর রা. ইসলামের জন্য যে খেদমত করেছিলেন তা অন্য যে কোন মুসলমানের চেয়ে বেশি ছিল
- যে কোন মুসলমানের চাইতে আবু বকর রা. এর ইসলাম এবং ও রাসূল প্রীতি ছিল অনেক অনেক বেশি

অনুশীলনী ৪০

ক. ছবি দেখে শূন্যস্থানে উপযুক্ত অক্ষর বসিয়ে খালি ঘরগুলো পূরণ কর অতঃপর যে নামটি পাওয়া যাবে তা শূন্যস্থানে বসিয়ে নিচের বাক্য গুলো পূরণ কর।

			ম	
			খা	রী
	ক		র	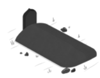
	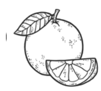		ম	লা
হা	ও			

---- ------ ছিলেন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময় নবী মুহাসম্মাদ সা এর সঙ্গী। যখন সর্ব প্রথম আল্লাহ হজ আদায় করা ফরজ করলেন, তখন নবী মুহাম্মদ সা. ---- ------ রা. কে প্রথম হজ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে মক্কায় পাঠালেন। নবী মুহাম্মদ সা. যখন তার জীবনের অন্তিম অসুস্থতায় আক্রান্ত তখন তিনি ---- ------ কে নামাজের ইমামতি করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন আর নবী নিজে তার পিছনে নামাজ পড়েছিলেন। এটা ছিল তার জন্য বিরাট একটা সম্মানের বিষয়। অবশেষে---- ------ রা. কে নবীজির পাশেই দাফন করা হয়। আজ পর্যন্ত যে বা যারা মদিনা ভ্রমণ করেন তাদের জন্য---- ------ রা. এর কবর জিয়ারতের সুযোগ রয়েছে। নিঃসন্দেহে নবী মুহাম্মদ সা. ছিলেন নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সাহাবীদের মধ্যে নবীজির সবচেয়ে প্রিয় পাত্র এবং অন্যান্য সকল নবীর সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে উৎসর্গিত ব্যক্তি ছিলেন ---- ------ রা.।

পাঠ ২

সায়্যেদাতুনা আয়েশা রা.

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে পারবে,

- *নবী মুহাম্মদ সা. এর প্রিয়তম স্ত্রী আয়েশা রা. এর মর্যাদা এবং তার অর্জনগুলো কী ছিল*
- *ইসলামে তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং দরিদ্রের প্রতি তার মহানুভবতা কেমন*
- *জীবন উন্নত হলেও একজন প্রকৃত মুসলমান কখনো সমাজের দুঃখ-দূর্ধবশাগ্রস্থ লোকদেরকে ভুলে যায় না*
- *যে অন্য মানুষের জীবনে শান্তি ও সুখ আনয়নের চেষ্টা করে আল্লাহ তার অন্তরকে সুখ-শান্তি দিয়ে ভরে দেন*
- *প্রকৃত মুসলমান নিজের চাইতে অন্য মুসলমানের সমস্যাকে বড় করে দেখে*
- *দ্বীনের কাজগুলো মুমিনের জীবনের বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং উন্নতির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ*
- *আয়েশা রা. ছিলেন মুসলিম মহিলাদের জন্য অনুসরণীয় সর্বোত্তম আদর্শ*

সায়্যেদাতুনা আয়েশা রা.

আয়েশা রা. ছিলেন নবী মুহাম্মদ সা. এর সবচেয়ে প্রিয় সাহাবী আবু বকর রা. এর মেয়ে। আয়েশা রা. নবী মুহাম্মদ সা. এর ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন। তার সুন্দর চেহারার কারণে তাকে ‘হুমাইরা’ (লাল গাল বিশিষ্ট) নামে ডাকা হতো।

তিনি ইসলাম শিখেছিলেন তার পিতা আবু বকর রা. ও নবী মুহাম্মদ সা. এর কাছ থেকে। আয়েশা রা. ইসলামের যে কোন মহিলার চেয়ে জ্ঞানে ও গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

প্রথম স্ত্রী খাদিজার ইন্তেকালের পর নবী মুহাম্মদ সা. আয়েশা রা. কে বিবাহ করেন। তিনি নবী মুহাম্মদ সা. এর স্ত্রীদের মধ্যে অতি আদুরে ও অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন। আয়েশা রা. অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমতী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সা. এর ওফাতের পর লোকেরা ইসলাম শিক্ষার জন্য তার কাছে এসে ভিড় জমাত। তিনি ছিলেন একজন সাহসী মহিলা, যিনি অনেকগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলতে কখনো কাউকে ভয় করতেন না। তিনি নিজে সাদামাটা জীবন চালাতেন আর তার সময় ও সম্পদ অভাবীদের জন্য ব্যয় করতেন।

তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম, যাদের নবী মুহাম্মদ সা. বেহেশতের অগ্রিম সুসংবাদ দিয়েছিলেন। আয়েশা রা. ছিলেন সকল যুগের মহিলাদের মধ্যে অনন্য ও শ্রেষ্ঠ।

অনুশীলনী ৪১

ক. সত্য-মিথ্যা নির্ণয় কর। যথাযথ ঘরে ঠিক (✓) চিহ্ন দাও।

সত্য	মিথ্যা	
☐	☐	আয়েশা রা. ছিলেন সাহাবী উসমান রা. এর মেয়ে।
☐	☐	আয়েশা রা. কে তার সুন্দর চেহারার কারণে ‘হুমাইরা’ ডাকা হাত।
☐	☐	তিনি ইসলাম শিখেছিলেন কেবল তার পিতা আবু বকরের কাছ থেকে।
☐	☐	নবী মুহাম্মদ সা. খাদিজা রা. এর জীবদ্দশায় আয়েশা রা. কে বিবাহ করেন।
☐	☐	আয়েশা রা. অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন।
☐	☐	আয়েশা রা. এর দুর্বল দিক হল তিনি যুদ্ধে যেতে ভয় পেতেন।
☐	☐	তিনি সত্য কথা বলতে কখনো কাউকে ভয় করতেন না।
☐	☐	তিনি তার সময় এবং সম্পদ দরিদ্র এবং অভাবীদের জন্য ব্যয় করতেন।
☐	☐	আয়েশা রা. ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত মহিলাদের একজন।
☐	☐	আয়েশা রা. ছিলেন সকল যুগের মহিলাদের মধ্যে অনন্য ও শ্রেষ্ট।

দানশীলতার এক বিরল দৃষ্টান্ত

আয়েশা রা. ছিলেন সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে দানশীল ব্যক্তি আবুবকর রা. এর কন্যা। আর তিনি ছিলেন দুনিয়ার শ্রেষ্ট দানশীল নবী মুহাম্মদ সা. এর প্রিয়তম স্ত্রী। দুই মহান দানশীল ব্যক্তির বিশুদ্ধ তালিম ও তারবিয়াত আয়েশা রা. কে দানশীলতার উচ্চ স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল।

একদা আয়েশা রা. এর কাছে দুটি থলে ভর্তি রৌপ্যমুদ্রা উপহার হিসেবে এসে পৌঁছল। গুনে দেখা গেল এক লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা। সে সময়ের জন্য এটা ছিল বিরাট অংকের একটি উপহার। একবার চিন্তা করে দেখতো, এত মূল্যবান উপহার যদি তোমাকে কেউ দিত, তাহলে তোমার মনে কি পরিমান আনন্দ আসতো? কিন্তু এতো বিশাল অংকের উপহার পেয়েও আয়েশা রা. খুশি হলেন না। বরঞ্চ তার মন দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

এই উপহার পেয়েও তার চোখ দিয়ে পানি এল। তার চোখের পানি তার লাল গালের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তার দাসী দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করল, *“আপনি কাঁদছেন কেন? কি হয়েছে? বড় ধরনের কোন অঘটন ঘটেছে কিনা?”*

আয়েশা রা. নিজ হাতে চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, *“না তেমন কিছু হয়নি? আমার কোন সমস্যা হয়নি, তবে আমি অন্যের সমস্যা নিয়ে কাঁদছি। এ নগরীর এতিম অসহায় শিশু এবং বিধবাদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করেই কাঁদছি। আচ্ছা বলতো, এই উপহার দিয়ে কিভাবে আমি নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে তুলতে পারি? যেখানে এই মদিনায় অসংখ্য অসহায় অনাথ শিশু আর বিধবারা ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে। দু’বেলা পেট ভরে খেতে পারছে না। নেই তাদের পরনে পর্যাপ্ত পোশাক। আয়েশা রা. বললেন, “আমি খুশি হতে পারতাম, যদি তাদের খাওয়ার জন্য যথেষ্ট খাদ্য থাকতো, যদি তাদের পরনে থাকতো পর্যাপ্ত পোশাক*

পরিচ্ছদ। এই শীতের সময়ে তারা যদি পর্যাপ্ত কাপড় দিয়ে শীত নিবারণ করতে পারত।"

আয়েশা রা. বিলম্ব না করে তার ভারী শালটি গায়ে জড়িয়ে দাসীকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ধুলোময় রাস্তা ও পাথরের গলি পেরিয়ে তিনি তার চেনা জানা সকল এতিম ও বিধবা পরিবারের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। একে একে মদিনার একটি কুঁড়েঘর থেকে আরেকটি কুঁড়েঘরে তিনি হেটে চলছেন আর নিজ হাতে উপহার হিসাবে পাওয়া সেই রৌপ্যমুদ্রাগুলো বিলিয়ে যাচ্ছেন। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা চলে এলো। যখন ঘরে ফিরলেন তার হাতে একটিও রৌপ্যমুদ্রা বাকি থাকলো না। সন্ধ্যাবেলা তার চেহারায় আনন্দের আভা। চোখে তার আনন্দের জ্যোতি জ্বলজ্বল করছে। মদিনার অনাথ এতিম ও বিধবাদের কিছু তিনি দিতে পেরেই তার মন আনন্দিত। কিছুদিনের জন্য অন্তত তাদের অভাব তিনি মোচন করতে পেরেছেন।

কিন্তু আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো সেই দিন তিনি ছিলেন রোজা। তিনি ঘরে পৌঁছার পর তার দাসী ইফতারের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য রান্না করে গেল। আয়েশা রা. সারাদিন বাহিরে হাঁটাহাঁটিতে অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত ছিলেন। ইফতারে তার জন্য ভালো একটা খাবারের প্রয়োজন ছিল। ইতোমধ্যেই মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে উঠলো "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার- আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান"। আযান শুনে আয়েশা রা. এর চেহারায় হাসির আভা। কারণ, তিনি আল্লাহর জন্য একটি রোজা রাখতে পেরেছেন আর সেই সাথে তার সদকা যার বিনিময় তিনি আল্লাহর কাছে পাবেন।

ইতিমধ্যেই তার দাসী তার কাছে ইফতার নিয়ে এসে হাজির হল। দাসীর হাতে এক টুকরো রুটি ও তার সাথে সামান্য যাইতুন তেল। "*আমি চেয়েছিলাম অন্তত একটি দিরহাম আমরা ইফতারের জন্য রেখে দেই, যাতে আমরা কিছু গোশত*

কিনে নিয়ে আসতে পারি।” দাসী বলল। “*অত্যন্ত দুঃখিত, তুমি যদি আমাকে আগে বলতে, তাহলে আমি সেখান থেকে একটি দিরহাম রেখে দিতে পারতাম।”* আয়েশা রা. স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলেন।

অসহায় ও দুঃখী মানুষের প্রতি তার হৃদয়ের ভালবাসার এ ছিল এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ ভালবাসা এতই ব্যাপক ছিল যে, তিনি তার নিজের ক্ষুধার কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

অন্য আরেক দিনের ঘটনা, তিনি ছিলেন রোজাদার আর তার কাছে ইফতারের জন্য এক টুকরো রুটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এক দরিদ্র ব্যক্তি তার দরজায় এসে সাহায্য চাইল। আয়েশা তার দাসীকে ঘরে থাকা ঐ রুটির টুকরোটি দিয়ে দেওয়ার জন্য বললেন। দাসী বললো, যদি রুটির টুকরোটি গরিব লোকটাকে দিয়ে দেই, তাহলে আপনার ইফতারের জন্য কিছুই তো থাকবে না। আশা বললেন, কোন অসুবিধা নেই, রুটির টুকরোটি দরিদ্র ব্যক্তিকে দিয়ে দাও।

নবীজির প্রিয়তম সাহাবী উরওয়া রা. বলেন, “*আমি একদিন দেখলাম আয়েশা রা. একদিনে ৭০ হাজার রৌপ্যমুদ্রা দান করে দিলেন অথচ তার পরনে ছিল একটি তালি দেওয়া ছেড়া জামা।”*

দানশীলতার এই ধরনের অনেক বিরল উদাহরণ পেশ করেছিলেন নবীজির প্রিয়তম স্ত্রী আয়েশা রা.। মুসলিম মহিলাদের জন্য এগুলো উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। আর তা হবেই না কেন? তিনি তো ছিলেন সকল নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এক মহিয়সী নারী।

এই গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্ন লিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক ও অভিভাবক শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন

- আমরা উপহার পেয়ে যেভাবে আনন্দিত হই তেমনি অন্যদেরকে উপহার দিয়ে আনন্দিত করাও উচিত
- সুখ সমৃদ্ধির সময় একজন প্রকৃত মুসলমান কখনো অসহায় লোকদের ভুলে যায় না
- অন্যের জন্য দুঃখবোধ ঈমানদারের চোখে পানি নিয়ে আসে
- একজন প্রকৃত মুসলিম কখনো সুখ পায় না, যখন তার পাশে অন্য মুসলমানরা কষ্টের মধ্যে থাকে
- একজন প্রকৃত মুসলিম সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অভাবী লোকদের অভাব দূর করা থেকে দূরে থাকতে পারে না
- আল্লাহ তাদের হৃদয়কে আনন্দ দ্বারা ভরে দেন যারা অন্যের হৃদয়ে সুখ-শান্তি আনয়নের চেষ্টা করে
- একজন মুসলমান রোজা অবস্থায় তার নেক আমলগুলোকে বাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে
- একজন প্রকৃত মুসলমান কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং পুরস্কার পাওয়ার আশাই রোজা রেখে থাকে
- রোজা অবস্থায় বান্দা যে নেক আমলগুলো করে আল্লাহ তার পুরস্কার বহুগুনে বাড়িয়ে দেন
- সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভ
- অন্যের উপকার সাধন করতে গিয়ে একজন প্রকৃত মুসলমান অনেক সময় নিজের দুঃখের কথা ভুলে যায়
- একজন প্রকৃত মুসলিম সর্বদা অন্যের দুঃখ দুর্দশা দূর করাকে নিজের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে
- একজন ভিক্ষুককে কখনো দরজা থেকে তাড়িয়ে দেয়া বা ধমক দেওয়া উচিত নয়
- ভিক্ষুককে সামান্য কিছু দিয়ে দেওয়া উচিত অথবা কমপক্ষে মুচকি হেসে সুন্দর কথা বলে বিদায় করা উচিত
- সুন্দর পোশাক পরিধানের চাইতে একজন সত্যিকার মুসলিম মহিলার কাছে দান সদকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ
- আয়েশা রা. দুনিয়ার সকল মুসলিম মহিলাদের মধ্যে দ্বীনদারিতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন

অনুশীলনী ৪২

ক. নিচের বাক্যটি রং কর অতঃপর নির্দেশিত স্থানে তিনবার লিখ।

নবী মুহাম্মদ সা. তার স্ত্রী আয়েশা রা. কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

১. ____

____

২. ____

____

৩. ____

____

খ. নিচের আরবি নামটি রং কর অতঃপর তার সম্পর্কে তিনটি অর্থপূর্ণ বাক্য লিখ।

عائشة

১.

২.

৩.

সমাপ্ত

ঋণ স্বীকার

“***শিশু মনে দ্বীনের আলো***” সিরিজের বইগুলো ইংলিশ সিরিজ ‘***MY FAITH: ISLAM***’ এর অনুকরণে লিখিত। ‘***MY FAITH: ISLA***M’ সিরিজটি লিখেছেন প্রখ্যাত গবেষক, খ্যাতিমান শিক্ষক ও সুসাহিত্যিক মাওলানা ফয়সাল ছোটিয়া। ১৯৭০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ এ জন্ম গ্রহণকারী এ ইসলামী পণ্ডিত ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রি ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বাধিক সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান “মাদ্রাসা আরাবিয়া ইসলামিয়া (দার আল-উলুম আজাদভিল)” এ। নিজ জন্মভূমি ছাড়াও ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মত উন্নত দেশে শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা তার রয়েছে। আমার লিখিত “***শিশু মনে দীনের আলো***” সিরিজ উপর্যুক্ত সিরিজের হুবহু অনুবাদ না হলেও এর প্রতিচ্ছবি বলা যেতে পারে। আমার লেখা সিরিজের অধিকাংশ উপাদান এই সিরিজ থেকে নেয়া। আমি লেখকের কাছে চির কৃতজ্ঞ। আল্লাহ মূল লেখককে ও আমাকে উভয় জাহানের কল্যাণ দান করুন। আমিন।

শিশু মনে দ্বীনের আলো ১-৫

‘শিশু মনে দ্বীনের আলো’ সিরিজের পাঁচটি বইয়ে যে সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে:

১.ইসলামী আকাইদ ও আমল আখলাক
২.মাসনুন দুয়া দুরুদ ও এ সংকান্ত আদাবসমূহ
৩.প্রাত্যহিক জীবনের জরুরি ফিকহ ও আহকাম
৪. কুরআনের আলোকে নবীদের গল্প
৫. হাদিসের আকর্ষণীয় গল্পসমূহ
৬.নবী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সমূহ
৭. প্রথম সারির সাহাবীদের জীবনী
৮. ইতিহাসের শিক্ষণীয় গল্পসমূহ
৯. সুরা ফাতেহা সহ শেষ দশটি সূরার অর্থ ও ব্যাখ্যা
১০.সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ ২০ টি হাদিসের অর্থ ও ব্যাখ্যা

‘শিশু মনে দ্বীনের আলো’ সিরিজটির অনন্য বৈশিষ্টসমূহ:

১. শিশুদের বয়স অনুপাতে বিষয় নির্বাচন
২. শিশুদের বোধগম্য ভাষা ও শব্দ চয়ন
৩. আকর্ষনীয় পদ্ধতিতে সহজ উপস্থাপন
৪. নির্ভরযোগ্য উৎস হতে বিষয় সাজানো
৫. সহজ অনুশীলনী ও হাতের কাজ
৬. অধ্যায়গুলো পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ
৭. অযথা দীর্ঘ করণ ও বাহুল্য বর্জন
৮. প্রতিটি অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ‘এনিমেশন ভিডিও’

‘শিশু মনে দ্বীনের আলো’ সিরিজটি কেন আপনার শিশুর জন্য প্রয়োজন?

১. আপনার শিশুর কচি মনে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা তৈরী করতে
২. আপনার শিশুকে ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত করতে
৩. শিশুকে ইসলামী আকিদা বিশ্বাস ও নৈতিক গুণাবলির উপর গড়ে তুলতে
৪. শিশুকে প্রাত্যহিক জীবনে ইসলামী বিধি বিধান মেনে চলায় অনুপ্রাণিত করতে
৫. শিশুকে ইসলাম শিক্ষায় অধিক আগ্রহী করতে ও খাঁটি মুসলিম হিসাবে গড়ে তুলতে

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ
Call: +44 7455847045
Web: ischoolportal.uk